ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ডঃ আবদুল করিম জায়দান

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ড. আবদুল করিম জায়দান

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪৫

১৪শ প্রকাশ

জিলহজ	১৪৩৩
কার্তিক	১৪১৯
নভেম্বর	২০১২

বিনিময় ঃ ৪৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMI RASHTRO BEBOSTHA. by Dr Abdul Karim Zaidan. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 45.00 Only

www.icsbook.info

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামী শরীয়তে রাষ্ট্রের মর্যাদা	৯
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের নির্দেশ	৯
শরীয়তের নির্দেশ পালন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা	১০
আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র জরুরী	১১
প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা	১৫
রাষ্ট্রের নানা বিভাগ	১৬
রসূলের ব্যক্তিত্বে নবুওয়াত ও প্রশাসকতার সমন্বয়	১৭
দারুল ইসলাম	১৮
ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও লক্ষ্য	২০
রাষ্ট্র সংস্থা ও সংগঠন	২২
রাজনৈতিক অধিকার	২৩
নির্বাচনের অধিকার	২৩
জাতিই সার্বভৌমত্বের উৎস	২৭
প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন	২৭
আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ	৩০
বির্তমান সময়ে 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ' নির্বাচনের উপায়	৩২
অলী আহাদ নিয়োগ	৩২
পরামর্শ গ্রহণে রসূল স.-এর সুন্নাত	৩৫
পরামর্শ গ্রহণ না করা অপরাধ	৩৬
কোন্ কোন্ বিষয়ে পরামর্শ	৩৬
পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতি	৩৭
আধুনিক সময়ে পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতি	৩৯
পরামর্শ পরিষদ ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বিরোধ ও মতবৈষম্য হলে	৪০
প্রথম পন্থা ঃ শালিস নিয়োগ	৪১
দ্বিতীয় পন্থা ঃ সংখ্যাগুরুর মত মেনে নেয়া	৪২
তৃতীয় পন্থা ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের নিজের মত গ্রহণ	৪২
আমরা কোন্ পন্থা গ্রহণ করতে পারি	৪৩
রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনার অধিকার ও দায়িত্ব	৪৪

www.icsbook.info

রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতি ৪৬
পদচ্যুত করার নিয়ম ৪৭
পঞ্চম ঃ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার ৪৮
বর্তমানকালে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপার ৪৯
সরকারী চাকরিতে ব্যক্তিগত প্রার্থী হওয়ার রীতি ৫০
আধুনিক যুগে যোগ্য লোক নিয়োগের উপায় ৫২

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ৫৪
মৌলিক অধিকার বলতে কি বুঝায় ? ৫৪
আলোচনার পদ্ধতি ৫৪
সাম্য ও সমতা ৫৪
ব্যক্তি স্বাধীনতা ৫৮
ব্যক্তির ইজ্জত-আবরু রক্ষা করা সরকারী দায়িত্ব ৬০
অমুসলিম ব্যক্তিস্বাধীনতা ৬১
আকীদা ও ইবাদাতের স্বাধীনতা ৬২
বাসস্থানের স্বাধীনতা ৬৪
কর্মের স্বাধীনতা ৬৫
ব্যক্তিগত মালিকানা রাখার অধিকার ৬৭
মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা ৬৮
ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমা ৭০
শিক্ষালাভের অধিকার ৭১
ভরণ-পোষণের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা লাভের অধিকার ৭২
ব্যক্তির অধিকার আদায়ে শরীয়তের বিধান ৭৪
সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ৭৫
সাহায্য লাভের অধিকার ৭৬
যাকাত ৭৬
বায়তুলমাল থেকে সাহায্য দান ৭৬
রাষ্ট্র এ সাহায্যদানে অক্ষম হলে ৭৭
অমুসলিম নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ৭৯
নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার ৭৯
প্রথম ঃ আনুগত্য পাওয়ার অধিকার ৮০
দ্বিতীয় ঃ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া ৮৫

www.icsbook.info

ইসলামী শরীয়তে রাষ্ট্রের মর্যাদা

সাধারণত মনে করা হয় ইসলাম একটি ধর্মমাত্র এবং ইসলামী শরীয়ত কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্র ও আল্লাহর সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-বিধানই পেশ করে। এছাড়া মানব জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের কিছুই বলার নেই। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলাম একেবারেই নীরব এবং সে পর্যায়ে মুসলমানরা যে কোনো নীতি বা আদর্শ গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান এ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে। এ পর্যায়ে আমার বক্তব্য এখানে পেশ করছি ঃ

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের নির্দেশ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শরীয়তে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল কাজ ও ব্যাপার সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন ও বিধান। জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে না, যে বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় রয়েছে ইবাদাত, নৈতিক চরিত্র, আকীদা-বিশ্বাস এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কাজকর্ম এবং লেনদেন পর্যায়ে সুস্পষ্ট বিধান। এর প্রত্যেকটি বিষয়ই ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য। মানব সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টি—স্বতন্ত্রভাবে এক একজন ব্যক্তি অথবা সমষ্টিগতভাবে গোটা সমাজ সম্পর্কেই আইন-বিধান রয়েছে ইসলামী শরীয়তে। এভাবে আল্লাহর এ দাবী সত্য হয়েই দেখা দিয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ـ الانعام : ٣٨

"আল কিতাব—কুরআন মজীদে আমি কিছুই অবর্ণিত রাখিনি।"

—সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

অন্য কথায় আল্লাহর দাবী হলো, কুরআনেই আমি জরুরী সব কথা বলে দিয়েছি। কিছুই বাদ রাখিনি, বাকী রাখিনি।

বস্তুত ইসলামী শরীয়তের বিধান আল্লাহর এ দাবীর সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। শরীয়তের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত যাবতীয়

www.icsbook.info

বিষয়েই আইন-বিধান দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তার পরামর্শভিত্তিক তথা গণতান্ত্রিক হওয়া, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতা, ন্যায়সঙ্গত কাজে তাদের আনুগত্য, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অকাট্য বিধান রয়েছে ইসলামী শরীয়তে। আর তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাই নয়, রসূলে করীম স.-এর সুন্নাতেও রয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ সংক্রান্ত বিধান। কুরআন-হাদীসে 'আমীর', 'ইমাম' ও 'সুলতান' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দগুলো বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যার হাতে রয়েছে সার্বভৌমত্ব, শাসন ও আইন রচনার ক্ষমতা। আধুনিক পরিভাষায় তাই হলো সরকার বা গভর্নমেন্ট। সরকার বা গভর্নমেন্ট হলো রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাজেই যেসব আয়াত এবং হাদীসের যেসব উক্তিতে এ পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করা একান্তই জরুরী। কেননা, এগুলো শুধু পড়া বা মুখে উচ্চারণের জন্যই বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে এজন্যে যে, তা যেমন পড়া হবে তেমনি তাকে কার্যকরী করাও হবে। আর এগুলো কার্যকরী করতে হলে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র কায়েম করা অপরিহার্য।

শরীয়তের নির্দেশ পালন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

তাছাড়া শরীয়তের এমন অনেকগুলো আইন-বিধান রয়েছে যা কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে সেগুলোর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভবপর নয়। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের পরস্পরের বিচার-ফায়সালা করার এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে কুরআন-হাদীসে। কিন্তু রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ না করবে ততক্ষণ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। এজন্যেই জনগণের উপর কোনো কিছু কার্যকরী করার ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা একান্তই জরুরী। এ পর্যায়ের যাবতীয় হুকুম-বিধানের প্রকৃতিই এমনি। একথাটি বুঝাবার জন্যই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ

اِنَّ وِلاَيَةَ اَمْرِ النَّاسِ اَعْظَمُ وَاجِبَاتِ الدِّيْنِ بَلْ لاَقِيَامَ لِلدِّيْنِ اِلاَّ بِهَا وَلاَنَّ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْجَبَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنُصْرَةَ الْمَظْلُوْمِ وَكَذٰلِكَ سَائِرُ مَا اَوْجَبَهُ مِنَ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَاِقَامَةِ الْحُدُوْدِ لاَ تَتِمُّ اِلاَّ بِالْقُوَّةِ وَالْاِمَارَةِ ـ

www.icsbook.info

"জনগণের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করা—রাষ্ট্র কায়েম করা দীনের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। বরং রাষ্ট্র ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। আরো কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি জিহাদ, ইনসাফ ও আইন-শাসন প্রভৃতি যেসব কাজ ওয়াজিব করে দিয়েছেন তা রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না।"

–আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩।

অতএব শরীয়তের আইন-বিধান জারী ও কার্যকরী করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা একটি অপরিহার্য জরুরী কর্তব্য।

আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র জরুরী

কথা এখানেই শেষ নয়। আল্লাহর ইবাদাতের দায়িত্ব পালনের জন্যেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ـ الذاريات : ٥٦

"আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

কুরআনের এ ইবাদাত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। আল্লাহ তাআলা যেসব কথা, কাজ—প্রকাশ্য বা গোপনীয়—ভালোবাসেন ও পসন্দ করেন তা সবই এর অন্তরভুক্ত। (فتاوى ابن تيمية ج اص ٣٠٤ وما بعدها)

'ইবাদাত' শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় কথা, কাজ, ব্যবহার প্রয়োগ, আয়-ব্যয় ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ—এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবন ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত পথ ও পন্থা এবং নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী সুসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য হয়। তা যদি করা হয় তাহলেই আল্লাহর মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সার্থক হতে পারে। অন্যথায় মানুষের জীবনে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না, আল্লাহর উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে মানব জীবন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মানুষের জীবনকে এদিক দিয়ে সার্থক করতে হলে গোটা সমাজ ও পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে এ দৃষ্টিতে জীবন যাপন করা তাদের পক্ষেই সহজ-সাধ্য হয়ে উঠে। কেননা মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই যাপিত হয় মানুষের জীবন আর মানুষ যে সমাজ

www.icsbook.info

পরিবেশে বসবাস করে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই হচ্ছে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। এ প্রভাব স্বীকৃতির ফলেই মানুষ যেমন ভালো হয় তেমন মন্দও হয়। যেমন হয় হেদায়েতের পথের পথিক তেমনি হয় গোমরাহীর আঁধার পথের যাত্রী। সহীহ হাদীস থেকে সমাজ-পরিবেশের এ অনস্বীকার্য প্রভাবের কথা সমর্থিত। নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تَجُسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُوْنُوْا اَنْتُمْ تَدْعُوْنَهُ۔

"প্রত্যেকটি সন্তানই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাধীন জন্মগত প্রকৃতিতে ভূমিষ্ঠ হয়। অতপর তার পিতামাতা হয় তাকে ইহুদী বানিয়ে দেয়, নয় খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজক। ঠিক যেমন করে পশু প্রসব করে তার পূর্ণাঙ্গ শাবক। তাতে তোমরা কোনো খুঁত দেখতে পাও কি, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা তাতে খুঁত সৃষ্টি করে দাও ?"–আল মুনতাখাব মিনাস সুন্নাহ, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

এ হাদীস অনুযায়ী ছোট্ট শিশুর পিতামাতা সমন্বিত সমাজই হচ্ছে তার জন্যে ছোট্ট সমাজ। এ সমাজ পরিবেশেই হয় তার জন্ম, লালন-পালন এবং ক্রমবৃদ্ধি। অতএব পিতামাতা যে রকম হবে তাদের সন্তান হবে ঠিক তেমনি। তারা যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাহলে তারা তাদের সন্তানকেও পৌঁছে দেবে গোমরাহীর অতল গহ্বরে। আল্লাহ যে সুস্থ প্রশান্ত প্রকৃতির উপর শিশুকে পয়দা করেছেন তা থেকে তারা বহিষ্কৃত করে নেয়। পক্ষান্তরে তারা যদি সত্যদর্শী ও নেককার হয় তাহলে তারা তাদের সন্তানকে আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতির ওপর বহাল রাখতে এবং একে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, বিপর্যস্ত সমাজ ইসলামের বিধি-নিষেধ কার্যকরী করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মুসলমান সেখানে ইসলামের উদ্দেশ্যানুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে না। তখন সেখান থেকে অন্যত্র এক অনুকূল সমাজ পরিবেশে হিজরত করে চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ ـ النساء : ٩٧

www.icsbook.info

"ফেরেশতাগণ যেসব লোকের জান এ অবস্থায় কবজ করেছে যে, তারা ছিল আত্ম-অত্যাচারী, তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল ছিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, আল্লাহর যমীন কি বিশাল প্রশস্ত ছিল না, সেখানে তোমরা হিজরত করে যেতে পারতে ? এসব লোকের পরিণাম হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।"–সূরা আন নিসা ঃ ৯৭

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন ঃ

فنزلت هذه الاية العامة فى كل من اقام ليتظهر انى المشركين وهو قادو على الهجرة وليس متمكنا من اقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالاجماع .

"এ আয়াত নাযিল হয়েছে সাধারণভাবে সেসব লোক সম্পর্কে যারা মুশরিক সমাজে বসবাস করে এমতাবস্থায় যে, তারা দীন কায়েম করতে সক্ষম না হলেও তারা সেখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় তারা হয় আত্ম-অত্যাচারী। হিজরত না করেও কুফরি সমাজে বাস করে তারা যে হারাম কাজ করেছে এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে 'ইজমা' রয়েছে।"

–তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত আয়াত এবং তার তাফসীর অনুযায়ী স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করা এবং শরীয়তের বিধান মত সমাজের লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে কেবল গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তির পক্ষে ইসলামী জীবন যাপন কেবল এরূপ পবিত্র পরিবেশেই সম্ভব, সম্ভব নানা প্রকারের ইবাদাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মপূর্ণতা লাভ করা। যে সমাজ সেরূপ নয় সেখানে তা সম্ভবও নয়।

কিন্তু ইসলামী সমাজ গঠন করা কিভাবে সম্ভব ? তা কি শুধু ওয়াজ-নসীহত বক্তৃতা-ভাষণেই কায়েম হতে পারে ? ... না তা সম্ভব নয়। সে জন্যে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। ইসলামী রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সম্ভব ইসলামের আদর্শ সমাজ গঠন। কেননা, এরূপ একটি রাষ্ট্র কায়েম হলেই তা দ্বারা ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর মতামত প্রচার ও শরীয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম বন্ধ করা সম্ভব। এ কাজের জন্যে যে শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন তা কেবল এ রাষ্ট্রের হাতেই থাকতে পারে, কোনো বেসরকারী ব্যক্তি বা সমাজ

www.icsbook.info

সাধারণের হাতে এ শক্তি ও ক্ষমতা কখনোও থাকে না। কুরআনের আয়াত থেকেও তা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط ـ الحديد : ٢٥

"বস্তুত আমি পাঠিয়েছি আমার নবী-রসূলগণকে এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড—যেন লোকেরা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আরো নাযিল করেছি 'লৌহ'। এর মধ্যে রয়েছে বিযুক্ত অনমনীয় শক্তি এবং জনগণের জন্য অশেষ কল্যাণ। আরো এজন্য যে, কে আল্লাহ এবং তার রসূলের অগোচরে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে তাকে যেন আল্লাহ জানতে পারেন।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫

'লৌহ' মানে শক্তি—রাষ্ট্রশক্তি, যে লোক কুরআনের হেদায়াত পেয়ে দীনের পথে চলতে উদ্যোগী হবে না রাষ্ট্রশক্তি তাকে গোমরাহী ও বিপর্যয় সৃষ্টির পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে। 'নৌকার আরোহীরা ডুবে মরুক' এ উদ্দেশ্যে নৌকায় ছিদ্র সৃষ্টি করার অধিকার কাউকে দেয়া যেতে পারে না। সমাজকে যে শক্তি বিপর্যয় ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে তাহলো রাষ্ট্রশক্তি, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। হযরত উসমানের একটি কথা স্মরণীয় ঃ

ان اللّٰه ليزع بالسلطان ما لايزع بالقران

"কুরআন দ্বারা যে হেদায়াত প্রাপ্ত হয় না আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা হেদায়াত করেন।"

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যখন ইসলামী শরীয়তের স্বাভাবিক দাবী ও প্রবণতা, শুধু তা-ই নয় ইসলামী শরীয়ত যখন তারই জন্য নির্দেশ দেয় তখন সে কাজ রসূলে করীম স.-এরও কর্তব্যের অন্তরভুক্ত না হয়ে পারে না। তাই ইতিহাস প্রমাণ করেছে, রসূলে করীম স. এমনি একটি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য মক্কা শরীফে থাকাবস্থায়-ই বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আর তার সূচনা হয়েছিল আকাবার দ্বিতীয়বারের 'শপথ' কালে এবং মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করার পূর্বেই এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিলো। ইতিহাসে এ পর্যায়ে যে বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে তার সারকথা হলো ঃ মদীনার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল মক্কা শরীফে এক গোপন স্থানে রসূলে করীম স.-এর সাথে মিলিত হয়। পুরুষ ও নারী মিলিয়ে তাদের সংখ্যা ছিলো তিহাত্তর

www.icsbook.info

জন। এ গোপন বৈঠকে রসূলে করীম স. তাদের সামনে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করার দাওয়াত পেশ করেন। এ দাওয়াত পেশ করার পর প্রতিনিধি দলের একজন বলেন ঃ হে রসূল! আপনার হাতে বায়আত করবো কোন্ কোন্ কথার ওপর ? রসূলে করীম স. বলেন ঃ তোমরা আমার হাতে এই বলে বায়আত করবে যে, "তোমরা ভালো ও মন্দ উভয় অবস্থাতেই আমার কথা শুনতে ও মেনে চলতে প্রস্তুত থাকবে, তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের নিষেধ করবে—বিরত রাখবে। আর তোমরা আল্লাহর কথা বলবে, কিন্তু তাতে কোনো উৎপীড়কের ভয় করবে না। আর তোমাদের বায়আত হবে একথার ওপর যে, তোমরা আমার সার্বিক সাহায্য করবে। আর আমি যখন তোমাদের মাঝে এসে বসবাস করতে থাকবো তখন যেসব ব্যাপার থেকে তোমরা নিজেদেরকে, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করো তা থেকে তোমরা আমাকেও রক্ষা করবে। আর এর বিনিময়ে তোমাদের জন্যে জান্নাত নির্দিষ্ট থাকবে।"

(আলবেদায়াতু ওয়ান নেহায়াতু লিল ইমাম ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, ১৫৯ পৃ. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা এবং ইমতাউল ইসমা লিল মিকরিযী, ৩৫ পৃ.) একথা শুনে প্রতিনিধি দলের লোকেরা রসূলে করীম স.-এর সামনে উঠে দাঁড়ালো এবং রসূল স.-এর উল্লেখিত শর্তাবলী মেনে নিয়ে বায়আত করলো।(ঐ)

প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

বস্তুত রসূলে করীম স. এবং মুসলিম প্রতিনিধি দলের মাঝে এভাবে যে বায়আত অনুষ্ঠিত হলো, তা-ই ছিলো প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক সুস্পষ্ট চুক্তিনামা (Contract)। এ চুক্তিনামায় আল্লাহর প্রভুত্বের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রসূলে করীম স.-এর থাকবে এবং তারা তা অবশ্যই মেনে চলবে বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো। নতুন প্রতিষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রের আওতায় যাবতীয় বিষয়ে রসূলের আনুগত্য করে চলা, তাঁকে বাস্তব সাহায্য করা এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি পেশ করা হয়েছিলো। আর এই হলো রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। এ প্রসংগে রাষ্ট্রনীতি ও আদর্শেরও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন রসূলে করীম স.-এর কথায় উল্লিখিত হয়েছে 'ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।'

অতপর নবী করীম স. মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর সাহাবীদেরও তিনি মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

ان اللّه عز وجل قد جعل لكم اخوانا ودار تامنون بها

www.icsbook.info

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে বহু ভাই সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং এমন এক স্থান জোগাড় করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা আশ্রয় নিতে পারো।"–সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

নবী করীম স. মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন এবং তাঁর মসজিদ নির্মাণ করলেন, তখন ঃ "নবী করীম স. মুহাজির ও আনসারদের মাঝে একটি চুক্তিনামা রচনা করলেন তাতে ইহুদীদেরও শরীক করা হলো। তাদের সাথে একটা চুক্তি স্থিরীকৃত হলো। তাতে তাদেরকে তাদের ধর্ম ও ধন-সম্পদের ওপর তাদের অধিকার স্বীকার করা হলো। তাদের ওপর কিছু কর্তব্য আরোপিত হলো এবং তাদের জন্য কিছু অধিকার স্বীকার করে নেয়া হলো।"–সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

এমনিভাবে দুনিয়ার প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ সংস্থাপিত হলো। আর রসূলে করীম স. ছিলেন এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। এ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই তিনি ইহুদীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। এ সন্ধিও ছিলো রসূলে করীম স.-এর রাষ্ট্রশক্তির বহিঃপ্রকাশ। অতপর তিনি আভ্যন্তরীণ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য আরোপ করেন এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংস্থাপন করেন। এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ফলেই তারা পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে প্রস্তুত হলো। যদিও পরে মীরাসী আইন নাযিল হয়ে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়।–আল বেদায়াতু ওয়ান নেহায়াতু লি-ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, ২২৪ পৃ.।

রাষ্ট্রের নানা বিভাগ

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এই ঃ "এক সুসংবদ্ধ জনসমাজ, একটি নির্দিষ্ট এলাকা যার মালিকানাধীন, যার সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা রয়েছে এবং যার রয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য তা-ই রাষ্ট্র।"

ড. মুস্তফা কামিল—জনৈক আরব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন ঃ "জনগণের একটি সুগঠিত দল, যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিকারী সার্বভৌমত্ব সম্পন্ন যার একটি ভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।"

–শারহুল কানুনুদ দস্তুরী, ২৫ পৃ.।

রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞাই দেয়া হোক না কেন, তার পাঁচটা দিক অনিবার্য ঃ (১) সুসংবদ্ধ জনসমাজ, (২) যা একটি ব্যাপক ব্যবস্থার অনুগত, (৩) একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী, (৪) সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, (৫) আর তার রয়েছে ভাবগত স্বাতন্ত্র্য। নবী করীম স. মদীনায় যে রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন

www.icsbook.info

তাতে রাষ্ট্রের এসব কয়টি উপাদানই (elements) যথাযথভাবে বর্তমান ছিল। জনসমাজ (population) বলতে সেখানে ছিল মুহাজির ও আনসার মুসলিমগণ। তারা যে সামগ্রিক ব্যবস্থা মেনে চলতো, তা ছিল ইসলামী শরীয়তের আইন ও বিধান। আর মদীনা ছিল রাষ্ট্রের অঞ্চল (territory)। তাদের জন্যে যে সার্বভৌমত্ব ছিল তা রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নবী করীম স. জনগণের কল্যাণে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। এ সমাজের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ছিল সুস্পষ্ট, সুপ্রকাশিত। নবী করীম স. রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে যেসব চুক্তি সম্পন্ন করতেন তা পালন ও রক্ষা করে চলা জনগণের সকলের পক্ষেই অপরিহার্য কর্তব্য হতো। ব্যক্তিগতভাবে কেবল রসূলে করীম স. সে জন্যে দায়ী হতেন না।

রসূলের ব্যক্তিত্বে নবুওয়াত ও প্রশাসকতার সমন্বয়

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার দরুন রসূলের ব্যক্তিত্বের একই সাথে কয়েক প্রকার গুণের সমাবেশ ঘটে। নবুওয়াত ও আল্লাহর দীন প্রচারের গুণ, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার গুণ, লোকদের পরস্পরের ফায়সালা করা ও ইনসাফ কায়েম করে যে বিচারক—সেই বিচারক হওয়ার গুণ। অনুরূপভাবে প্রশাসন ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতারও সমন্বয় সাধন হয় রসূলে করীম স.-এর ব্যক্তিসত্তায়। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আল্লাহর শরীয়তের মুবাল্লিগ, নবী ও রসূল।

ইসলামের ফিকাহবিদগণ রসূলে করীম স.-এর ব্যক্তিত্বে এ গুণসমূহের সমাবেশের কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন এবং এর বিভিন্ন দিকের গুণের দিক দিয়ে তিনি যেসব আদর্শ ও হুকুম দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ তিনি নবী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান পেশ করেছেন তাহলো সর্বসাধারণের জন্যে প্রযোজ্য বিধান। সবার ওপরে সে আইন অবশ্যই জারি করতে হবে। আর যেসব বিধান তিনি মুসলমানদের নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দান করেছেন তা কেবল রাষ্ট্রপ্রধানেরই করণীয়। আর বিচারপতি হিসাবে যে ফায়সালা দিয়েছেন সেরূপ ফায়সালা একজন বিচারক বা বিচারপতিই দিতে পারেন। এখন রসূল স.-এর কোন্ কথাটি কোন্ হিসাবে দেয়া নবী হিসাবে না রাষ্ট্রপ্রধান বা কাজী হিসাবে ? তা নিয়ে ফিকাহবিদদের ইজতিহাদে কিছুটা মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমন, রসূল স.-এর একটি ফরমান হলো ঃ

عن احياء ارضا ميتة فهى له

"যে লোক কোনো মৃত যমীন চাষাবাদ করে জীবন্ত ও ফসলযোগ্য বানালো তা তারই জন্যে।"

www.icsbook.info

এ ফরমানটি তিনি কোন্ হিসাবে দিয়েছেন ? ... রসূল হিসাবে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ? ... না কাজী ও বিচারক হিসাবে ? সব ফিকাহবিদই এ হাদীসের উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু কেউ বলেছেন, এটি হচ্ছে রসূলে করীম স.-এর একটি ফতোয়া এবং একথা বলে তিনি আল্লাহর ফায়সালা-ই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন মাত্র। অতএব এ ফায়সালা সর্বসাধারণের জন্যে এবং যে লোকই এ কাজ করবে সে-ই সংশ্লিষ্ট জমির মালিক হতে পারবে, রাষ্ট্রপ্রধান তার অনুমতি দিক আর না-ই দিক। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী এ মত পোষণ করেছেন। আবার একটি মত হলো, একথা তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বলেছিলেন, অতএব মৃত জমি কেবল জীবন্ত করে তুললেই তার মালিক হওয়া যাবে না, বরং সে জন্যে সরকার ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন। এ মত হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার। এমনিভাবে তাঁর আর একটি হুকুম হচ্ছে, তিনি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে বলেছিলেন ঃ

خُذِىْ لَكِ وَلِوَلَدِكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ -

"তোমার নিজের ও তোমার সন্তানের জন্যে প্রচলিত নিয়মে যাকিছু প্রয়োজন সেই পরিমাণ তুমি অনায়াসেই এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার ধন-সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পারো।"

এ হাদীসকে ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন ঃ নবী করীম স.-এর কথাটি হলো তাঁর একটি ফতোয়া, শরীয়তের হুকুম পৌঁছিয়ে দেয়ারই কাজ। কাজেই এ ফতোয়ার ভিত্তিতে যে কেউ তার হক আদায় করে নিতে পারে তার স্বামীকে না জানিয়েও এবং তা সম্পূর্ণ জায়েয হবে। ইমাম শাফেয়ী এ মতই গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে কেউ কেউ বলেছেন ঃ এ হচ্ছে নবী করীম স.-এর বিচারপতি হিসাবে দেয়া ফায়সালা। অতএব বিচারকের ফায়সালা ছাড়া কেউ তার হক স্বামীকে না জানিয়ে তার ধন-সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পারে না।–আলফূরুক কিরাফী, ১ম খণ্ড, ২০৭-২০৮ পৃ.।

দারুল ইসলাম

'দারুল ইসলাম' কথাটি হলো ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটি বিশেষ পরিভাষা। এ পরিভাষা অনুযায়ী রাষ্ট্রই হলো দারুল ইসলাম—ইসলামের দেশ। মুসলিম ফিকাহবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে 'দারুল ইসলাম' বলেই উল্লেখ করেছেন। এখানে 'দার' শব্দটি আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের 'রাষ্ট্র' বা এর-ই সমার্থক। ফিকাহবিদগণ দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন ঃ

دار الاسلام اسم للموضع الذى يكون تحت يد المسلمين

www.icsbook.info

"দারুল ইসলাম এমন অঞ্চলের নাম যা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে।"–শারহু সিয়ারিল কবীর লিসসারাখসী, ১ম খণ্ড, ৮১ পৃ.।

এ সংজ্ঞায় দুটো জিনিসের উল্লেখ রয়েছে স্পষ্ট—একটি হলো রাষ্ট্র, অপরটি অঞ্চল (territory), রাষ্ট্র সংক্রান্ত অন্যান্য কথাও এর মধ্যে রয়েছে। যেমন রাষ্ট্রের অধিবাসী জনতা (population), আর দ্বিতীয় হলো রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কেননা, একথা স্বতসিদ্ধ যে, মুসলমানরা আল্লাহ ও রসূল এবং কুরআন ও সুন্নায় বিশ্বাসী বলে তারা যখন দুনিয়ার কোনো ভৌগলিক এলাকায় শাসন কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তখন অবশ্যই ইসলামী আইন-বিধান মুতাবিক যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এ ভাষায়ও দেয়া হয়েছে ঃ

هى التى تظهر فيها شعائر الاسلام بقوة المسلمين ومنعتهم

"দারুল ইসলাম হলো এমন দেশ, যেখানে ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-বিধান সপ্রকাশিত ও বিজয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।"

–শারহুল আযহার, ৫ম খণ্ড, ৫৭১-৫৭২ পৃ.।

এ সংজ্ঞায় উল্লেখ রয়েছে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) কথা। সেই সাথে এতে রয়েছে রাষ্ট্রের অপরাপর উপাদানের (elements) কথাও। যেমন জনতা ও ভৌগলিক অঞ্চল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্যে দেশের সকল বাসিন্দাদের মুসলমান হতে হবে এমন কোনো শর্তই ফিকাহবিদদের দেয়া সংজ্ঞা থেকে প্রমাণিত হয় না। বরং সেখানে অমুসলিম নাগরিকও থাকতে পারে, থেকেছেও। এজন্যে ফিকাহবিদগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

الذى من اهل دار الاسلام

"যেমন অমুসলিম অধিবাসীরাও দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) নাগরিক।"–আলমাবসূত্ব লিসসারাখসী, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃ. এবং আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, ৫১৬ পৃ.।

অবশ্য কোনো কোনো ফিকাহবিদ কথাটিকে আরো উদারভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্যে অধিবাসীদের মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। বরং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শাসকের মুসলিম হওয়া এবং ইসলামী আইন-বিধান মোতাবেক শাসন সম্পাদন করাই 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী এ মত পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন ঃ

ليس من شرط دار الاسلام ان يكون فيها مسلمون بل يكفى كونها فى يد الامام واسلامه ـ

www.icsbook.info

"দারুল ইসলামে কেবল অধিবাসী মুসলমান হওয়া শর্ত নয় বরং রাষ্ট্র শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলাম অনুসরণ করাই সে জন্যে যথেষ্ট।"

–ফাতহুল আযীয, ৮ম খণ্ড, ১৫ পৃ.।

তার মানে নিশ্চয় এ নয় যে, ইমাম শাফেয়ীর মতে অমুসলিম নাগরিকদের ওপরও ইসলামী আইন জারি হবে। তাঁর কথার তাৎপর্য এই যে, একটি রাষ্ট্রকে 'ইসলামী' বলে চিহ্নিত করার জন্যে রাষ্ট্র শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র শাসন করাই প্রথম শর্ত। এ হয়ে গেলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও লক্ষ্য

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক চিন্তামূলক রাষ্ট্র। তা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের উপর, ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ওপর। এজন্যে ইসলামী রাষ্ট্র কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়। নয় বিশেষ কোনো জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা গোত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, প্রকৃতপক্ষে তাহলো একটি মতাদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং তার সীমা আওতা ও প্রভাব বিস্তীর্ণ ততখানি, যতখানি সম্প্রসারিত এ আদর্শের প্রভাব। এ কারণে তার জন্যে কোনো বিশেষ বর্ণ, জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার গুরুত্ব স্বীকৃত নয়। এ প্রকৃতির কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব বিশ্বরাষ্ট্র হওয়া, যেখানে থাকবে অসংখ্য জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী, বর্ণ ও গোত্রের লোক সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। কোনো আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ার কারণে তা কবুল করা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আর যখনি একজন লোক সে আকীদা গ্রহণ করে অমনি ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অধিকারী হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ? তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাই, যা প্রমাণিত ও স্বতপ্রকাশিত হয় তার প্রকৃতি থেকে। তা যতদিন একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র থাকবে, ততদিন তা থাকবে ইসলামী আদর্শ ও বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই সে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে তাই যা ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ কারণে নাগরিকদের জন্যে শুধু শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের জীবন সংরক্ষণ ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ পর্যন্তই তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দায়িত্ব সীমিত হয়ে যেতে পারে না। বরং রাষ্ট্রের সর্বদিকে সর্ব ব্যাপারে ও সর্ব ক্ষেত্রেই ইসলামী আইন বিধান পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী করা, জারি করা এবং মানব সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী দাওয়াত পৌছে দেয়াও তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের

www.icsbook.info

অন্তরভুক্ত। সেই সাথে ইসলামী আকীদা মোতাবেক ব্যক্তিগণকে আল্লাহর বন্দেগী করা, বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ এবং ইসলামী বিধান মোতাবেক বাস্তব পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের অবাধ সুযোগ সুবিধে করে দেয়াও তার কাজ। ইসলামের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের মন-মগজ ও মানসিকতা এবং স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণকে ইসলাম অনুরূপ বানিয়ে দেয়াও তার বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এখানেই শেষ নয়, ইসলামী আদর্শের বিকাশদান ও তা অনুসরণ করে চলার পথে যত প্রকারেরই প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তার সব দূর করা, ইসলাম বিরোধী চিন্তা, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় মতের প্রতিরোধ করাও তার কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। একথাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○ - الحج : ٤١

"তারা সেইসব লোক, যাদের আমি যদি দুনিয়ার কোনো অংশে ক্ষমতাসীন করে দেই, তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রচলন করবে, লোকদেরকে যাবতীয় মারূফ কাজে বাধ্য করবে ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখবে। বস্তুত সব ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহরই জন্যে।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১

এখানে 'নামায কায়েম করার' কথা বলে বুঝানো হয়েছে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিককে আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে তৈরি করার কাজ। যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে জনকল্যাণের সুষ্ঠু বুনিয়াদে পুনর্গঠিত করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর মারূফ কাজের আদেশ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখার কথা বলে ইংগিত করা হয়েছে জনগণের জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধে করে দেয়া ও সর্ব ব্যাপারে ইসলামী আইন-কানুন জারি করার দিকে।

এসবই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এসব কিছুরই লক্ষ্য রাষ্ট্রের জনগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শরীয়ত ভিত্তিক কল্যাণ সাধন। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে অন্যান্য সর্বপ্রকার রাষ্ট্রের তুলনায় অধিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

❐

www.icsbook.info

রাষ্ট্র সংস্থা ও সংগঠন

ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার অতীব স্পষ্ট এবং প্রকট। ব্যক্তির স্বাতন্ত্রকে সেখানে কখনোই অস্বীকার করা হয় না বরং ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ের যাবতীয় অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, প্রত্যেক ব্যক্তি অবাধে কাজ করতে পারে সেখানে স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশদানের জন্যে, নিজস্ব রুচি ও ঝোঁকপ্রবণতা চরিতার্থতার জন্যে। ব্যক্তির অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রে এক স্বাভাবিক অধিকাররূপেই স্বীকৃতি পায় এবং তার ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ বা তাকে ক্ষুণ্ন ও ব্যাহত করার অধিকার দেয়া যেতে পারে না কাউকেই। ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রের কল্যাণ ও স্থিতি, উন্নতি লাভ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার জন্যেই অপরিহার্য। সেখানে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মাঝে কোনো বিরোধ নেই, হবে না কোনো সংঘর্ষ। পরস্পরের বিরোধ সৃষ্টিতে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে মনে হয় না। স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থায়ই ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তির মর্যাদা এমনি-ই হয়ে থাকে।

তবে ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় শুধু তখন, যখন এ দু'য়ের কোনো একটি ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধতা করতে উদ্যত হয়। কেননা, এ দু'য়ের মাঝে যে মিল, মৈত্রীর সম্পর্ক, তা শুধু এ ইসলামের কারণেই এবং ইসলামের ভিত্তিতেই। এ ভিত্তিকে কেউ অস্বীকার বা উপেক্ষা করলে অপর পক্ষ সক্রিয়ভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। এজন্যে ইসলাম ব্যক্তিকে যা কিছু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তা সে সেখানে পুরোপুরিই লাভ করতে পারে। কেননা, ইসলাম ব্যক্তিকে যাকিছু দিয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই তা দেবে, দেবে নিজের আভ্যন্তরীণ তাগীদেই। বিশেষত এজন্যে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার লাভে ধন্য হওয়া-ই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। অধিকার দিলেই রাষ্ট্র মজবুত হবে আর না দিলে তার বুনিয়াদ হবে দুর্বল। বস্তুত জনগণের অধিকার হরণ করে যে রাষ্ট্র, তার মত দুর্বল ক্ষণভংগুর রাষ্ট্র আর একটিও হতে পারে না। এজন্যে ব্যক্তিদের অধিকারের ওপর অকারণ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে কি না, সেদিকে তীব্র-তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের এক স্থায়ী স্বভাব।

www.icsbook.info

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সে আলোচনার জন্যে ব্যক্তির অধিকারসমূহকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে নেবো ঃ রাজনৈতিক অধিকার ও সাধারণ অধিকার। এ দু'য়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

রাজনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের সংজ্ঞা হলো ঃ

اَلْحُقُوْقُ الَّتِىْ يَكْتَسِبُهَا الشَّخْصُ بِاعْتِبَارِهِ عُضْوًا فِىْ هَيْئَةٍ سِيَاسِيَةٍ مِثْلَ حَقِّ الْاِنْتِخَابِ وَالتَّرْشِيْحِ وَتَوَلِّىْ وَالْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ فِىْ الدَّوْلَةِ ـ

"একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার কারণে, অর্থনৈতিক লালন-পালন ও রাষ্ট্রের সাধারণ সুযোগ-সুবিধে প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক একজন নাগরিক যা কিছু লাভ করে, তা-ই তার রাজনৈতিক অধিকার রূপে গণ্য।"

–উসুলুল কানুন লিদদাকতুর সিনহুরা, ২৬৮ পৃ.।

অথবা তার সংজ্ঞা হবে ঃ

هى الحقوق التى يساهم الفرد بواسطتها فى ادارة شئون الدولة او فى حكمها ـ

"রাষ্ট্রের আওতায় বা তার বিধান অনুযায়ী ব্যক্তি যাকিছু লাভ করে তা-ই তার রাজনৈতিক অধিকার।"–আল কানুনুদ্দুয়ালীল খাস লিদদাকতুর জাবের জাদ, ১ম খণ্ড, ২৭২ পৃ.।

এ দৃষ্টিতে ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তিকে কি সব অধিকার দিয়েছে, অতপর আমরা তার উল্লেখ করবো। তাতে করে শরীয়তের দেয়া অধিকার ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের বিবৃত অধিকারে যে কোনো বিরোধ বা পার্থক্য নেই, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নির্বাচনের অধিকার

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন ঃ দেশে রাষ্ট্রপ্রধান কে হবে, সে ব্যাপারে মত জানার অধিকার রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের। ফলে নাগরিকগণ যে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য নির্বাচিত করবে সে-ই হবে রাষ্ট্রপ্রধান। ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ এ পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাদের একটি স্পষ্ট উক্তি হলো ঃ

www.icsbook.info

من اتفق المسلمون على امامته وبيعته ثبتت امامته ووجبت معونته

"যে ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলিম নাগরিকগণের মতৈক্য হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে যার হাতে 'বায়আত' হবে তারাই ইমামত (রাষ্ট্রপ্রধান) হওয়া স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারই সাহায্য-সহযোগিতা করা সকলের প্রতি-ই অবশ্য কর্তব্য।"

–আলমুগান্নী লে-ইবনে কুদামা হাম্বলী, ৮ম খণ্ড, ১০৬ পৃ.।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ

الامامة - اى رياسة الدولة - تثبت بمبايعة الناس - اى الرئيس الدولة - لاالسابق له -

"রাষ্ট্রের নেতৃত্ব জনগণের বায়আতের ভিত্তিতে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জনগণ যখন কারোর হাতে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করে, তখনি সে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে, পূর্ববর্তী কোনো পদাধিকার বলে নয়।"–মিনহাজুস সুন্নাত, ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃ.।

এসব সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাষ্ট্রপ্রধান হবে সে, যাকে সমাজের জনগণ রাষ্ট্রপ্রধানরূপে বাছাই ও নির্বাচিত করবে এবং তার প্রতি এ জন্যে সন্তুষ্ট থাকবে। জনগণের এ অন্তোষ ও নির্বাচনের ফলেই এক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নয়।

কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ব্যাপারে জনগণের এই যে অধিকার তার ভিত্তি কি ?.... কি কারণে জনগণের এ অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে ?

এ অধিকারের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়েছে পরামর্শ নীতির ওপর। ইসলামী শরীয়ত এ পরামর্শ নীতির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজ যেহেতু শরীয়তের বিধান কার্যকরী করার জন্যে দায়ী এবং সে দায়িত্ব এই পারস্পরিক পরামর্শ নীতির ভিত্তিতেই প্রতিপালিত হতে পারে। আর সে কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে ব্যক্তির 'পরামর্শ' দানের অধিকার অনস্বীকার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এ পরামর্শ নীতির মূল উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ - الشورى : ٣٨

"মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৩৮

এ আয়াতাংশ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের সকল ব্যাপার বিশেষভাবে যাবতীয় গুরুতর সামাজিক ও জাতীয় ব্যাপার পারস্পরিক

www.icsbook.info

পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করতে হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারটি নিসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল জাতীয় ও সামাজিক ব্যাপার। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস সহকারে কাজ করার জন্যে প্রয়োজন তার পিছনে সক্রিয় জনসমর্থন বর্তমান থাকা। এ সমর্থন আছে কি নেই, কত সংখ্যক লোকের রয়েছে, কত সংখ্যকের নেই, বেশীর ভাগ লোকের এ সমর্থন বা আস্থা রয়েছে কার ওপর, তা নিসন্দেহে জানার একটি মাত্র উপায়-ই হতে পারে। সে উপায় হলো জনগণের রায় জানার জন্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন। অতএব রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে সে কাকে পেতে চায়—কার ওপর আস্থা আছে, তা জানার অধিক—সুযোগ দিতে হবে।

দ্বিতীয়, শরীয়ত কার্যকর করণ জাতীয় দায়িত্ব। শরীয়তের আইন-বিধান কার্যকর ও জারী করার দায়িত্ব সমাজের, জাতির, জনগণের। সে জন্যে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজ ও জাতির-ই কর্তব্য। কুরআন থেকে এ বিধান অকাট্যভাবেই প্রমাণিত। আর তার সমর্থনে ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট। কুরআন মুসলিম সমাজ ও জাতিকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছে এই বলে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ النساء : ١٣٥

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে উঠো আল্লাহর জন্যে সাক্ষদাতারূপে তা যদি তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও যায়, তবুও।"

বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ـ المائدة : ١

"হে ঈমানদার লোকেরা ! প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণ করো।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ১

বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ التوبة : ٧١

"ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মেয়েলোক পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। তারা সবাই ভালো কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ الاعراف : ٣

www.icsbook.info

"তোমাদের রবের কাছ থেকে যা-ই নাযিল হয়েছে তা-ই তুমি পালন করে চলো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص ـ

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককেই একশটি কোড়া মারো।"
–সূরা আন নূর ঃ ২

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا ـ المائدة : ٣٨

"পুরুষ চোর ও মেয়ে চোর—প্রত্যেকেরই হাত কেটে দাও।

কুরআন মজীদের এ আয়াতসমূহে এবং এমনিতর আরো বহু সংখ্যক আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শরীয়তের আইন বিধান কার্যকর করা এবং এ কার্যকারিতার জন্যে বাস্তব ও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব মুসলিম সমাজের।

এ সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালনের জন্যেই সমাজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল হওয়া একান্তই অপরিহার্য। সেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি সমাজ ও জাতীয় দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে এসব কর্তব্যসমূহ যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করবে।

কেননা, শরীয়তের তরফ থেকে গোটা সমাজ ও জাতির ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সমাজ ও জাতি হিসাবে তাতো পালন করতে পারে না। সমাজের সকলে মিলে এক সাথে এ কাজ করা অসম্ভব। এ কারণেই প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আদিম কাল থেকে সভ্য সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে। তাই সমাজ ও জাতি-ই তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, যেন সমাজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব সমাজের পক্ষ থেকে সে পালন করতে পারে। অতএব এ প্রতিনিধি নির্বাচন করার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার অত্যন্ত ন্যায়সংগত ও স্বাভাবিক। এ অধিকার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন—কোনো আপত্তিই তোলা যেতে পারে না। কেননা, যে লোক যে জিনিসের মালিক সে জিনিসের ব্যাপারে প্রতিনিধি বা 'উকিল' নিয়োগ করার অধিকার তারই থাকতে পারে, অন্য কারোর নয়। আর রাজনীতির দৃষ্টিতে জাতি—মুসলিম সমাজই—রাষ্ট্রের মালিক। সে মালিকানায় শরীক প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও। অতএব সে রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও। তাই রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগে প্রত্যেক ব্যক্তির ভোট দেয়ার অধিকার—প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষ নয়—প্রত্যেকটি নাগরিকের। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না।

www.icsbook.info

জাতিই সার্বভৌমত্বের উৎস

রাষ্ট্রপ্রধান যখন জাতির প্রতিনিধি, তখন একথা স্পষ্ট যে, তাকে প্রতিনিধি নিয়োগকারী জাতিই হবে সার্বভৌমত্বের উৎস। এজন্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় ঃ রাষ্ট্রপ্রধান জাতির নামে ও জাতির প্রতিনিধি হিসাবেই সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ করে।

সেই সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, জাতি যদিও এ সার্বভৌমত্বের উৎস কিন্তু তার সার্বভৌমত্ব কোনো অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়, নয় নিরংকুশ। বরং তা আল্লাহর অসীম-অশেষ-সর্বাত্মক সার্বভৌমত্বের অধীন, তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত হয়েছে তারই ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য দেয়া শরীয়তের বিধানের মাধ্যমে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, জাতির সার্বভৌমত্ব হচ্ছে প্রশাসন সংক্রান্ত, কার্যকর করার সার্বভৌমত্ব Execution-এর সার্বভৌমত্ব। তা অসীমও নয়, জন্মগতও নয়, নয় নিজস্ব অর্জিত কিছু। কাজেই সে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না, আল্লাহর বিধানের বিপরীত পন্থায় ও কাজে তা প্রয়োগও করতে পারে না। আল্লাহর বিধানকে তা পরিবর্তনও করতে পারে না। আর জাতিই যখন আল্লাহর শরীয়ত বদলাতে পারে না, তার বিরুদ্ধতা করতে পারে না, তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, তখন রাষ্ট্রপ্রধান—যে হলো জাতির প্রতিনিধি, নির্বাচিত—ভারপ্রাপ্ত, সেও এরূপ কাজ করার অধিকারী নয়। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগকারী জাতি যে কাজ করার অধিকার দেয়নি, সে কাজ করার কোনো অধিকার তার কেমন করে থাকতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতি যদি আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত কোনো আইন প্রণয়ন করে বা তার বিপরীত কোনো ফরমাশ বা অর্ডিনেন্স জারী করে অথবা জাতির প্রতিনিধি রাষ্ট্রপ্রধান তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে এ উভয় অবস্থায়ই এ কাজটি শরীয়তের সনদবিহীন বলে গণ্য হবে এবং সার্বভৌমত্বের নির্দিষ্ট সীমালংঘন করার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা জাতির সার্বভৌমত্ব হলো বাস্তবায়নের সার্বভৌমত্ব (Executing Sovereignty)। তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হচ্ছে আল্লাহর শরীয়তকে কার্যকর করার মধ্যে, কোনো নতুন শরীয়ত বা শরীয়ত বিরোধী আইন রচনা করে তা জারি করার মূলগতভাবেই তার কোনো অধিকার নেই।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জাতির এক সাধারণ ও মৌলিক অধিকার। কিন্তু এ অধিকার তারা কিভাবে প্রয়োগ করবে ? জাতির ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ

www.icsbook.info

ও সরাসরিভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবে, না পরোক্ষভাবে ? সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, শরীয়তে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে কোনো পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বরং তা জাতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তারা দেশ-স্থান-কাল ভেদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনো একটা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। এ উভয় ধরনের নির্বাচনের-ই অবকাশ ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। তবে কুরআনের আয়াতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সনদই অনেকটা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

কুরআনের আয়াত ঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ - الشورى : ٣٨

"তাদের যাবতীয় ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই মীমাংসিত হয়।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৩৮

বাহ্যত ও স্পষ্টত প্রত্যক্ষ নির্বাচনকেই সমর্থন করে। আর রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন যেহেতু গোটা জাতির একটা সাধারণ অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপার, কাজেই এ কাজের জন্যে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন শরীয়ত অনুযায়ী ভোটের অধিকারী প্রত্যেকটি মানুষই ভোটদান করতে পারে। এ ছোট আয়াতের ভিত্তিতে আমরা এইমাত্র যাকিছু বললাম তার স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়, এ আয়াতের বিভিন্ন তাফসীরে। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী লিখেছেন ঃ

اذ وقعت واقعة اجتمعوا وتشاوروا فاثنى اللّٰه عليهم اى لاينفردون برای بل مالم يجتمعوا عليه لايعزمون عليه ـ

"যখন কোনো ঘটনা সংঘটিত হতো তখন তারা সকলে একত্রিত হতেন এবং পরস্পর পরামর্শ করতেন। এজন্যে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁরা কেউ নিজের ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে কাজ করতেন না। বরং সবাই একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতেন না।"

–তাফসীরুর রাজী, ৩৭ খণ্ড, ১৭৭ পৃ.।

অবশ্য পরোক্ষ নির্বাচনের সমর্থন পাওয়া যায় ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে খিলাফতে রাশেদার নির্বাচনে। এ ছিলো ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার যুগ। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকের নির্বাচনে প্রথমে অংশগ্রহণ করে মুসলিম জাতির অল্পসংখ্যক লোক। ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাদের বলা হয় 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'—দায়িত্ব সম্পন্ন সমঝদার লোক। পরে মদীনায় অবস্থিত অপরাপর লোকেরা তাদের অনুসরণ করেছে, তারাও তাকেই খলীফারূপে মেনে নিয়েছে যাঁকে ইতিপূর্বেই সমাজের দায়িত্বশীল লোকেরা

www.icsbook.info

খলীফা পদে বরণ করে নিয়েছে। সমস্ত মুসলমান একত্রে একমত হয়ে কোনো খলীফাকেই নির্বাচিত করেনি। এ বিষয়ে যেমন খলীফাগণ নিজেরা কোনো আপত্তিও তুলেননি, তেমনি জনগণের মধ্য থেকেও এ সম্পর্কে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। ফলে রাষ্ট্রপ্রধানের এ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির যুক্তিযুক্ততার ওপর তাদের 'ইজমা' হয়েছে বলা চলে। পরোক্ষ নির্বাচনের স্বপক্ষে এটি একটি দলীল বটে। অতএব রাষ্ট্রপ্রাধন নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয়ের যে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করার অধিকার জাতির রয়েছে বলা চলে। কেননা কোনো অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই তার অধিকারের কাজটি সম্পন্ন করবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং সে ইচ্ছে করলে এ কাজের জন্যে স্বেচ্ছায় অপর একজনকে দায়িত্বশীলও বানাতে পারে। ইসলামের ফকীহগণও এ পরোক্ষ নির্বাচনের স্বপক্ষেই মত জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রাধন নির্বাচন করা 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদে'রই দায়িত্ব। অতএব এ কাজে সমগ্র জাতিকে যোগদান করানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। আল্লামা ইবনে খালদুন তার ইতিহাসের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

واذا تقور ان هذا المنصب اى منصب الخليفة واجب باجماع فهو من فروض الكفاية وراجع الى اختيار اهل الحل ولعقد فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق طاعته ـ

"একথা যখন স্থির হলো যে, খিলাফতের পদ কায়েম করা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব তখন তা 'ফরযে কেফায়া' পর্যায়ের কাজ এবং তা সম্পাদনের ভার 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'-এর ওপর বর্তাবে। এ কাজ সম্পাদন করা তাদেরই দায়িত্ব এবং জনগণের উচিত তাঁদের নির্বাচনকে মেনে নেয়া।"–মুকাদ্দমা ইবনে খালদুন, ১৯৩ পৃ.।

ইমাম মাওয়ারদী এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

والامامة (اى رياسة الدولة الاسلامية) تنعقد بوجهين احدهما باختيار اهل الحل والعقد والثانى بعهد الامام من قبله ـ

"ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন দু'ভাবে হতে পারে ঃ হয় তা আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ-এর ভোটে ও নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে, না হয় পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানের মনোনয়নে।"–আল মাওয়ারদী, ৪র্থ পৃষ্ঠা।

কিন্তু ইসলামী ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা-ই চূড়ান্ত, এর অন্য কোনোরূপ ব্যাখ্যা চলে না—এমন কথা বলা যায় না। আমরাও এর একটা ব্যাখ্যা পেশ করতে পারি এবং তা এভাবে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের সব কয়জনেরই

www.icsbook.info

নির্বাচন সাধারণ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন তখনকার সময়ে ও তদানীন্তন ভৌগলিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে সম্ভবপর ছিলো। প্রত্যেক খলীফার নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে এ ব্যাখ্যা কিছুমাত্র ভিত্তিহীন বিবেচিত হবে না। বিশেষত কুরআন মজীদ থেকে যখন প্রত্যক্ষ নির্বাচনেরই সমর্থন পাওয়া যায়, তখন তার বিপরীত ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।

আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ

রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচন যদি পরোক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়—যেমন ইসলামী শরীয়ত তাকে সমর্থন করেছে, তখন যারা তাকে প্রথম নির্বাচিত করে ফিকাহবিদগণ তাদের নাম দিয়েছেন 'আহলুল হল্লে ওয়াদ আকদ'। কিন্তু এ 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ' কারা ? জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক কি ? আর তারা এ মর্যাদা পায়-ই কি করে ?

পয়লা সওয়ালের জবাব হলো, ফিকাহবিদগণ কতগুলো গুণের উল্লেখ করেছেন, এ গুণ যাদের রয়েছে তারাই 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'। আল্লামা মাওয়ারদী এ পর্যায়ের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ এক, পূর্ণাঙ্গ 'আদালত'—সুবিচার-ন্যায়বাদী-বিশ্বস্ত হওয়া। দুই, শরীয়তের নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে জাতির মাঝে কোন্ লোকটি রাষ্ট্রপ্রধান বা সমাজ-ইমাম হওয়ার যোগ্য অধিকারী তা জানার ও বুঝার মতো জ্ঞান ও ইলম। তিন, জনগণের সার্বিক কল্যাণের দিক দিয়ে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিক যোগ্য ব্যক্তি চিনার ও বাছাই করার মতো বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা। এ তিনটি গুণ সমাজের যেসব লোকের বেশী আছে, তারাই 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ' হওয়ার যোগ্য। কোনো কোনো মুহাদ্দিস-ফকীহ এ পর্যায়ের গুণাবলীর আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা রশীদ রেজা মিছরী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اولو الامر جماعة اهل الحل والعقد من المسلمين وهم الامرأ والحكام والعلماء ورؤساء الجندو وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس فى الحاجت والمصالح العامة ـ

"উলুল আমর" হচ্ছে মুসলমান সমাজের সবকিছু ভাঙ্গা-গড়ার জন্য দায়িত্বশীল। আর তারা হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের রাজন্যবর্গ, সর্বোচ্চ শাসক, আলেম-শিক্ষিত, সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, আর জনগণ নিজেদের প্রয়োজনে ও সার্বিক কল্যাণের ব্যাপারে যেসব চিন্তাশীল-

www.icsbook.info

বুদ্ধিমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি রুজু করে—আস্থা রাখে—তারা।"
—তাফসীরুল মানার, ৫ম খণ্ড, ১৮১ পৃ.।

একথা থেকে বুঝা গেল যে, 'আহলুল হল্লে ওয়াল-আকদ' বলতে বুঝায় সমাজের এমন সব লোককে যারা জনগণের অনুসরণীয়, আস্থাভাজন যাদের মতামত জনগণ মেনে নেয়, তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়।—এজন্যে যে, তাদের ভিতর নিস্বার্থতা, দৃঢ়তা, আল্লাহভীতি, সুবিচার ও ন্যায়-নিষ্ঠা, নির্ভুল রায় দান, সব ব্যাপারে গভীর তাৎপর্য অনুধাবন এবং সর্বোপরি জনকল্যাণের উদ্দম-আগ্রহ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় সওয়াল—জাতির সাথে 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'-এর সম্পর্ক সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এরা হবে জাতির প্রতিনিধি, উকীল—তাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কর্মসম্পাদনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তারা জনগণের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবে। অন্য কথায় নির্বাচনের অধিকার প্রয়োগের জন্য তারা হবে তাদের মনোনীত প্রতিনিধি। আর এজন্যে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন হবে কার্যত জাতির রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সমপর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় সওয়াল—জাতীয় ব্যাপারে তারা 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ' পর্যায়ভুক্ত হবে কেমন করে। এর জবাব এই যে, একথা তো স্পষ্ট যে, জাতিই তাদের এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে তাদের নিজস্ব বাছাই নির্বাচনের মাধ্যমে। আর অতীত ইতিহাস আমাদের বলে দেয়, জাতির লোকেরা একত্রিত হয়ে প্রথমে নিজেদের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে তাদের নির্বাচন করে নেবে। এ নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে, আবার তাদের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার ভিত্তিতেও হতে পারে।

'খিলাফতে রাশেদার' যামানায় যেসব লোক এ মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন তারা নিজেদের স্বাভাবিক নীতিনিষ্ঠা, ইসলাম পালনে অগ্রগণ্যতা ও জনকল্যাণকামী হওয়ার দিক দিয়ে স্বতই এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে এজন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কেউ তাদের এ মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করেনি কখনো। এমনকি বলা যেতে পারে যে, তখন যদি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন করানো হতো, তাহলে এরাই এ পদমর্যাদায় নির্বাচিত হতেন। কাজেই তারা যখন প্রয়োজন মত রাষ্ট্রপ্রধান খলীফা নির্বাচন করেছে তখন জাতির প্রতিনিধি হিসাবেই তা করেছে। জনগণ তাদের নির্বাচনের বিরুদ্ধে কখনো গররাজি হয়নি, দ্বিমত প্রকাশ করেনি। বরং তাঁকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে নির্বাচিত খলীফার হাতে 'বায়আত' করেছে অকুণ্ঠ আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে।

www.icsbook.info

বর্তমান সময়ে 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ' নির্বাচনের উপায়

বর্তমান সময়ে পরোক্ষ নির্বাচন-নীতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে প্রথমে এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ' নির্বাচিত করা যেতে পারে। তারা জাতির ভোট ও আস্থা পেয়ে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্যে জাতির পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল হবে। এ উদ্দেশে জনগণ যাদেরকে নির্বাচিত করবে তারা নির্বাচনী কলেজের সদস্য হতে পারে। অথবা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যও হতে পারে। নির্বাচনী কলেজ হলে তাদের একমাত্র কাজ হবে নির্বাচনকালে ভোট দান করা এবং ভোট দানের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যেতে ও এ 'কলেজ' ভেঙ্গে যেতে হবে। তাদের দ্বারা অপর কোনো কাজই নেয়া যেতে পারে না।

অলী আহাদ নিয়োগ

ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ "রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হতে হবে পূর্ববর্তী খলীফার মনোনয়নে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ নীতির ভিত্তিতে।" মাওয়ারদী বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান দু'ভাবে নির্বাচিত হতে পারে ঃ এক, 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'-এর নির্বাচনের মাধ্যমে। দুই, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানের মনোনয়নের ভিত্তিতে।"–আল মাওয়ারদী, ৪ পৃষ্ঠা।

এভাবে 'অলী আহাদ' নিয়োগের রীতি কেমন করে গণতন্ত্রসম্মত বা গণনির্বাচনের পর্যায়ে গণ্য হতে পারে ?—এ একটা প্রশ্ন। এর জবাব এই যে, অলী আহাদ নিয়োগের অধিকারটি মূলত 'নামের প্রস্তাবনা পর্যায়ের মাত্র'। খলীফা নিজের হিসাবে তিনি কাকে পসন্দ করবেন তার নাম প্রস্তাব করবেন মাত্র। কিন্তু তার এ প্রস্তাবই চূড়ান্ত নিয়োগ নয়। খলীফা মৃত্যুর পূর্বে কারোর নাম বলে গেলেই জনগণ তার পরে তাকেই খলীফা মেনে নিতে বাধ্য নয়। এ কারণেই যেখানে যেখানে এরূপ অলী আহাদ নিয়োগ হয়েছে, সেখানেই পরবর্তী সময়ে 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'-এর লোকদের 'বায়আত' করতে হয়েছে। তাদের বায়আত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত ব্যক্তি খলীফারূপে বরিত হয়নি। যদি প্রস্তাবনা-ই খলীফা নিয়োগের জন্যে যথেষ্ট হতো, তাহলে এ বায়আতের কোনো প্রয়োজন হতো না। এমনকি এরূপ নাম প্রস্তাবনার পরেও জনগণ তাকে খলীফারূপে মেনে নিতে অস্বীকার করারও অধিকার রাখে।

নবী করীম স.-এর মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকাকালীন একটি কথা থেকেও একথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি তাঁর পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রের

www.icsbook.info

প্রধান কে হবেন, সে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তখন হযরত আয়েশা রা.-কে ডেকে একদিন বললেন ঃ

لقد هممت او ارادت ان ارسل الى ابى بكر وابنه واتعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون ثم قلت باذن الله ويدفع المؤمنون او يدفع الله ويابى المؤمنون - بخارى

"আমি আবু বকর ও তাঁর পুত্রকে ডাকবো ও তাঁর পক্ষে পরবর্তী খলীফা হওয়ার ওয়াদা গ্রহণ করবো। যেন পরে আপত্তিকারীরা আপত্তি না করে কিংবা আশা পোষণকারীরা আশা পোষণ না করে। পরে আমি চিন্তা করলাম যে, আল্লাহ এসব রুখবেন এবং মুসলমানরা তার প্রতিরোধ করবে অথবা অন্য কথায় আল্লাহ প্রতিরোধ করবেন ও মুসলমানরা রুখে দাঁড়াবেন।"

-বুখারী

এ হাদীসের শব্দ المؤمنون 'আল-মু'মিনূন' অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, খলীফা নির্বাচনের কাজ মু'মিন-মুসলমানের স্বাধীন ইচ্ছা ও মতের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে হবে এবং ইসলামে খলীফা নির্বাচনের উত্তম ও উন্নত আদর্শ হচ্ছে এ নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

হযরত আলী রা.-কে যখন লোকেরা খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করতে বললেন, তখন তিনি বললেন ঃ

فان بيعتى لاتكون خفيا ولا تكون الا عن رضا المسلمين

"আমার বায়আত গোপনে অনুষ্ঠিত হবে না এবং তা মুসলমান জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা ও মর্জি ছাড়া কিছুতেই হতে পারে না।"

এ কারণে কোনো কোনো ফিকাহবিদ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

الامامة تثبت بمبايعة الناس له لابعهد السابق له

"রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন সম্পূর্ণ হয় জনগণের বায়আতের ভিত্তিতে। জন-সমর্থনের মাধ্যমে। পূর্ববর্তী খলীফার মনোনয়নের ভিত্তিতে নয়।"

-মিনহাজুস সুন্নাহ ঃ ইবনে তাইমিয়া, ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃ.।

এ হলো জনগণের অধিকারের ব্যাপার। জনগণের আর একটি অধিকার হলো পরামর্শে শরীক হওয়ার। আসলে এ হলো জনগণের খলীফা নির্বাচনের পরবর্তী দায়িত্বের কাজ। জনগণ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবে, রাষ্ট্রপ্রধান হবে জনগণের যাবতীয় জাতীয় ও সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন কাজের ভারপ্রাপ্ত। সেই সাথে তার ওপর জাতির অধিকার হলো এই যে, সেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে

www.icsbook.info

জাতির পরামর্শ গ্রহণ করবে—পরামর্শ চাইবে এবং জাতি যে পরামর্শ দিবে সে তদনুযায়ী কাজ করবে।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধান তো স্বত-ই জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাহলে আবার জনগণের পরামর্শ গ্রহণে তাকে বাধ্য করার অর্থ কি ? তাহলে এর দু'ভাবে জবাব দেয়া যেতে পারে ঃ

এক ঃ রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তি এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে, জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাই সব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপারে তাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া ও তদনুযায়ী কাজ করা কর্তব্য। তাহলে এ পর্যায়ের অনেক ভুল ও মারাত্মক পদক্ষেপের হাত থেকে জাতি রক্ষা পেতে পারে।

দুই ঃ জাতি রাষ্ট্রপ্রধানকে জাতীয় কাজের জন্য দায়িত্বসম্পন্ন বানায় বটে, কিন্তু তা শর্তহীন নয়। তার মধ্যে একটি জরুরী শর্ত হলো এই যে, সে জাতির কাছে পরামর্শ চাইবে। কেননা, পরামর্শ চাওয়ার নির্দেশ শরীয়তে স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছে। এ অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকারের অন্তরভুক্ত। তাদের সে অধিকার হতে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না। কেননা রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা তা শরীয়তের বিধানের শর্তে সীমাবদ্ধ। সে শর্ত পূরণ না হলে রাষ্ট্রপ্রধান তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। নির্বাচনের সময় একথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হোক আর না-ই হোক একথা একান্তই অনিবার্য। আর জাতির পরামর্শ পাওয়ারও অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানের। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত হতে দেয়া যেতে পারে না।

রাষ্ট্রপ্রধানকে যে জাতির কাছে পরামর্শ চাইতে হবে এ বিষয়ে কুরআনের নির্দেশ স্পষ্ট ও অকাট্য। রসূলে করীম স.-কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সে হিসাবে সব ইসলামিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যেই এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। সে নির্দেশ হলো ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ج فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ - ال عمران : ١٥٩

"তুমি তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাও। আর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অনন্তর তুমি যখন কোনো সংকল্প-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

www.icsbook.info

এ আয়াতটি রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ চাওয়া ও গ্রহণ করার জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ওয়াজিব ; এজন্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন ঃ

لاغنى لولى الامر عن المشاورة فان الله تعالى امربه نبيه صلعم -

"কোনো রাষ্ট্রপ্রধান-ই পরামর্শ চাওয়া ও গ্রহণ করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে এজন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।"–আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যা, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

আর আল্লামা তাবারী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

انما امر الله نبيه بمشاورة اصحابه مما امره بمشاورتهم فيه تعريفا منه امته ليقتدوابه فى ذلك عند النوازل التى تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم

"আল্লাহ তাঁর নবীকে আসহাবগণের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ সেই পরামর্শ গ্রহণের জন্যে, যে বিষয়ে আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন যেন তাঁর উম্মতেরা তাদের ওপর অনুরূপ অবস্থা দেখা দিলে তারা তাদের অনুসরণ করে ও পারস্পরিক পরামর্শ করে।"–তাফসীরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

আর ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী লিখেছেন ঃ

قال الحسن وسفيان بن عيينة انما امر بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة ويصير سنة فى امته .

"হাসান বছরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেছেন ঃ আল্লাহ নবী করীম স.-কে পরামর্শ গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করে। আর এ নীতি তাঁর উম্মতের মধ্যে সুন্নাহরূপে অনুসৃত হয়।"–তাফসীরুল কবীর, ৯ম খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

পরামর্শ গ্রহণে রসূল স.-এর সুন্নাত

পরামর্শ গ্রহণ করা শাসকদের উপর জনগণের একটা অধিকার। নবী করীম স. এতো বড় সম্মান-মর্যাদা ও আসমানী ওহী পাওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও তাঁর আসহাবদের সাথে খুব বেশী পরামর্শ করতেন। উহুদ যুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবেলা করা হবে, না শহরে বসেই প্রতিরোধ করা হবে, এ নিয়ে সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করেছেন। বদর যুদ্ধেও তা-ই করেছেন। এ যুদ্ধে হুবার ইবনে মুনযির পানির স্থানে অবতরণ করার পরামর্শ

www.icsbook.info

দিয়েছিলেন। রসূলে করীম স. সে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে মদীনার কিছু ফসলের বিনিময়ে শত্রুদের সাথে সন্ধি না করার–যেন তারা ফিরে যায়—দু'জন সাহাবী পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ পরামর্শও গৃহীত হয়েছিলো।–তাফসীরে ইমাম রাজী, ৯ম খণ্ড, ৬৭ পৃ.। এমনিভাবে নবী করীম স. যে সাহাবাদের সাথে খুব বেশী পরামর্শ করতেন তার ভুরি ভুরি নযীর উল্লেখ করা যায়।

পরামর্শ গ্রহণ না করা অপরাধ

পরামর্শ দেয়া জনগণের অধিকার। রাষ্ট্রপ্রধানের তাই চাওয়া কর্তব্য। ফিকাহ্‌বিদগণ স্পষ্ট করে লিখেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান যদি এ কর্তব্য পালন না করে এবং জনগণকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে তবে এজন্যে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ "ইবনে আতীয়া বলেছেন ঃ পরামর্শ গ্রহণ রীতি ইসলামী শরীয়তের মৌল ব্যাপার। এজন্যে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। যে রাষ্ট্রপ্রধান দীন ও শরীয়তের বিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞদের কাছে পরামর্শ চাইবে না, তাকে বরখাস্ত করা ওয়াজিব। অন্য কথায় ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো স্বৈরাচারী শাসকের স্থান নেই।"

কোন্ কোন্ বিষয়ে পরামর্শ

জাতির জনগণের সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। আর যেসব বিষয়ে ইসলামের অকাট্য ঘোষণা বা নির্দেশ নেই সেসব ইজতেহাদী বিষয়েও পরামর্শ অনুষ্ঠিত হতে হবে। এক কথায় রাষ্ট্রপ্রধান দীন ও দুনিয়ার নানা বিষয়ে জাতির সাথে পরামর্শ করবে—পরামর্শ চাইবে ও গ্রহণ করবে। আল্লামা জাসসাস তাই লিখেছেন ঃ

والاستشارة تكون فى امور الدنيا وفى امور الدين التى لاوحى فيها -
احكام القران ج ٢ صفح ٤٠

"দুনিয়ার বৈষয়িক যাবতীয় বিষয়ে এবং দীনের যেসব বিষয়ে কোনো ওহী নাযিল হয়নি সে সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে হবে।"–আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৪০ পৃ.।

আর দুনিয়ার বা বৈষয়িক যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ ঘোষণা, বৈদেশিক নীতি ও চুক্তি-সন্ধি, রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি ইত্যাদি সব-ই এ পর্যায়ে গণ্য। অবশ্য নিত্য-নৈমিত্যিক ছোট ছোট ব্যাপারে জনগণের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের

www.icsbook.info

কোনো প্রয়োজন নেই। তা সম্ভবও নয়। তা করে রাষ্ট্র চালানো যায় না। তা যুক্তসংগত নয়, তাতে ফায়দাও কিছু নেই।

পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতি

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পরামর্শ গ্রহণের কাজ কিভাবে সম্পন্ন হবে ? ... আর জাতির সব লোকের সাথেই পরামর্শ করা কি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব, না তাদের মাঝ থেকে বিশেষ এক শ্রেণীর সাথে পরামর্শ করা হবে কিংবা কতিপয় ব্যক্তির সাথে। এসব প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, নবী করীম স. সমগ্র জনগণের সাথে পরামর্শ করতেন এমন সব ব্যাপারে যা সরাসরিভাবে সমগ্র জনতার সাথে সংশ্লিষ্ট, যা সকলের সামগ্রিক ব্যাপার। যেমন উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে সন্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মদীনা থেকে বাইরে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তিনি মদীনায় অবস্থিত সমস্ত মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ করেছেন। তিনি সকলকে লক্ষ করে বললেন ঃ "তোমরা সবাই আমাকে পরমার্শ দাও।"

হাওয়াজিনের যুদ্ধে লব্ধ গনীমাতের মাল কি করা হবে, তা নিয়েও তিনি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করেছেন। এ যুদ্ধে যত লোক শরীক হয়েছিলো, গনীমাতের ব্যাপারে তাদের সকলেরই মত তিনি জানতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে ইতিহাসে বলা হয়েছে, গনীমাতের মালের ব্যাপারে নবী করীম স. যা কিছু করণীয় করেছিলেন, তা সবারই সামনে পেশ করেছিলেন। তখন উপস্থিত সবাই এক বাক্যে বলে উঠেছিল ঃ "হে রসূল স.! আপনি যা ফায়সালা করেছেন তাতেই আমরা রাজি আছি এবং তা-ই মেনে নিলাম।"

তখন নবী করীম স. নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের পাঠালেন অনুপস্থিত অন্যান্য মুসলমানদের মত জানার জন্যে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারদের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারাও সবাই মেনে নিলো। একজন লোকও তাতে কোনো দ্বিমত প্রকাশ করলো না এবং এসব কথা নবী করীম স.-কে জানিয়ে দেয়া হলো। এভাবে পরামর্শ গ্রহণের এ বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হলো।[১] (ঐ ২৯ পৃ.)।

---

১. জনগণ নির্বাচিত কিংবা জনগণের আস্থাভাজন নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় জটিল বিষয়াদির পরামর্শ গ্রহণের নীতিও রসূলে করীম স. কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত চির সমুজ্জ্বল। এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাচ্ছে।

জটিল জাতীয় ব্যাপারসমূহে সমস্ত মুসলমানই ছিলো পরামর্শদাতা। সমস্ত মুসলিম জনগণের কাছেই তিনি পরামর্শ চেয়েছেন। কেননা এ ব্যাপারগুলোই ছিলো সমস্ত জনগণের সাথে সম্পর্কিত।

www.icsbook.info

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম স.-এর সময়ে যুদ্ধ ও গনীমাতের মাল বণ্টন ইত্যাদি হাওয়াজিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া ধন-সম্পদ ও যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে কি নীতি অবলম্বিত হবে, নবী করীম স. সে বিষয়টি সম্পর্কে স্বীয় প্রস্তাব এক বিরাট জনসমাবেশে জনতার সামনে পেশ করলেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইলেন। জবাবে জনতা সোচ্চার হয়ে উঠলো কিন্তু অসংখ্য লোকের একটি সমাবেশে প্রত্যেকটি নাগরিকের মত সুস্পষ্টরূপে শুনতে পাওয়া ও অধিক সংখ্যক লোক কি মত পোষণ করে তা হিসাব ও যাচাই করা এবং তদদৃষ্টে কোনো চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিলো। তাই নবী করীম স. সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

انا لا ادرى من اذن منكم ممن لم ياذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاكم امرتكم فرجع الناس فكلهم عرفائهم ثم ترجعوا الى النبى ﷺ فاخبروه انهم طيبوا واذنوا .

"তোমাদের কে স্বপক্ষে মত দিয়েছে, আর কে বিপক্ষে তা আমি জানতে পারলাম না। কাজেই তোমরা সবাই ফিরে যাও। পরে তোমাদের নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তিরা এসে যেন তোমাদের মত আমাকে জানিয়ে দেয়। এর পর লোকেরা ফিরে গেল এবং তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের মতামত জেনে নিলো। তারা এসে রসূলে করীম স.-কে জানিয়ে গেল যে, লোকেরা আপনার প্রস্তাবকে ভালো মনে করেছে ও সমর্থন করেছে।"

রসূল স.-এর জীবনের এমন অনেক ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সবারই সাথে নয় বিশেষ সাহাবীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। বদর যুদ্ধে যেসব কাফের বন্দী হয়েছিল তাদের সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে সব সাহাবীদের সাথে পরামর্শ না করে তিনি বিশেষ ও বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছেন। মদীনার এক-তৃতীয়াংশ ফসলের ভিত্তিতে গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধি করার ব্যাপারে নবী করীম স. কেবলমাত্র গোত্র-সরদার হযরত সায়াদ ইবনে মুয়ায ও সায়াদ ইবনে ওবাদার সাথেই পরামর্শ করেছিলেন। তখন তাঁরা দু'জন বলেছিলেন ঃ

"এ ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনি যদি আসমান থেকে নির্দেশ পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি তাই করুন। এ বিষয়ে যদি কোনো নির্দেশ আপনাকে না দেয়া হয়ে থাকে, আর এতে আপনি স্বাধীন হয়ে থাকেন, তাহলেও তা শিরোধার্য। কিন্তু এ যদি শুধু আমাদের মতের ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের

www.icsbook.info

কাছে তাদের জন্যে তরবারি ছাড়া আর কিছু নেই।" তখন নবী করীম স. তাঁদের দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং গাতফান কবীলার সাথে সন্ধি করার ইচ্ছা ত্যাগ করেন।–আমতাউল আসমা, ২৬৩ পৃ.।

বস্তুত এসব ঘটনা থেকেই রসূলে করীম স.-এর সুন্নত—আদর্শ কর্মনীতি জানা যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলে করীম স.-এর পরামর্শদাতা কখনো হতো সর্বসাধারণ মুসলমান, কখনো ঘটনাস্থলে উপস্থিত মুসলমানরা, কখনো বিশিষ্ট মুসলমানরা মাত্র। এসবের ভিত্তিতে আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, বিভিন্ন মানুষের সাথে পরামর্শ করবে। যদি বিষয়টি হয় সর্বসাধারণ মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাহলে সে বিষয়ে সেই সর্বসাধারণ মানুষের সাথেই পরামর্শ করতে হবে। আধুনিক পরিভাষায় তাকে আমরা বলি গণভোট বা (Referendum)। আর তা যদি সম্ভবপর না-ই হয় তাহলে তাদের আস্থাভাজন 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'-এর সাথে পরামর্শ করতে হবে। আর বিষয়টি যদি এমন হয় যা ভালো ও মন্দ দিক-ই শুধু জানতে হবে, তাহলে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। ইমাম কুরতুবী এ দিকে ইংগিত করেই বলেছেনঃ

"রাষ্ট্রকর্তারা যেসব বিষয়ে জানে না, সেসব বিষয়ে-ই তাদের পরামর্শ করতে হবে। দীন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে দীনের আলেমদের সাথে, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে। জনকল্যাণ বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে সাধারণ মানুষের সাথে। আর শহর-নগর নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে মন্ত্রী, সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে।"–তাফসীরে কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠা।

আল্লামা কুরতুবী আরো লিখেছেন, শরীয়তী হুকুম-আহকামের ব্যাপারে যাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে তাদের হতে হবে আলেম ও দীনদার। আর বৈষয়িক ব্যাপারসমূহে যাদের পরামর্শ চাওয়া যেতে পারে তাদের হতে হবে বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী দীর্ঘকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক।
–তাফসীরে কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠা।

আধুনিক সময়ে পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতি

আমরা পূর্বেই একথা স্পষ্টভাবে বলেছি, শুরা বা পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতির বিষয়ে রসূলে করীম স.-এর সুন্নাত প্রমাণ করে যে, ইসলামী শরীয়তে শুরার কোনো বিশেষ ও নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবস্থা বা কাঠামো পেশ করা হয়নি। এটাই

www.icsbook.info

হলো ইসলামী শরীয়তের সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্কতার নীতি। কেননা, শুরা বা পরামর্শ গ্রহণের কাজটি নানাভাবে সম্পন্ন হতে পারে এবং বিভিন্ন সময়ে তার রূপ বদলে যেতে পারে। বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের কাঠামোও গড়ে তোলা যেতে পারে। এমনকি, দেশ ভেদে তার বাস্তব কাঠামোর তারতম্যও হতে পারে। অতএব পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতি দেশের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নির্দিষ্ট করা জাতির দায়িত্ব। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের এ কালের উপযোগী পন্থা এটাই হতে পারে যে, জাতির জনগণ মজলিসে শুরার বা পার্লামেন্টের সদস্যদের নির্বাচিত করবে এবং তারা নির্বাচিত করবে রাষ্ট্রপ্রধানকে। আর এ সদস্যরাই রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ দেবে এবং রাষ্ট্রপ্রধানও এদের মত নিয়ে কাজ করতে বাধ্য থাকবে। অবশ্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে সাধারণ গণভোট গ্রহণ করারও পূর্ণ অধিকার থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের। মজলিসে শুরার (পার্লামেন্টের) সদস্যদের নির্বাচন করার পন্থা, পদ্ধতি ও নীতি এরাই নির্ধারিত করবে।

পার্লামেন্ট বা আইন-পরিষদ সদস্যদের নির্বাচনের ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বাছাই করার জন্যে কেবল একটা নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক করাই যথেষ্ট নয়। বরং সে জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার আবশ্যকতা রয়েছে। আর এ পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ইসলামী আদর্শ ও মৌলনীতির শিক্ষার ব্যাপক প্রচার জাতীয় নৈতিকতার মান উন্নতকরণ এবং আল্লাহর ভয় ও পরকাল বিশ্বাসের প্রেরণায় ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করা একান্তই জরুরী। তাহলেই আশা করা যেতে পারে যে, তারা যোগ্যতম ব্যক্তিদেরই নির্বাচিত করবে, এমন ব্যক্তিদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেবে যারা ইসলামী আদর্শকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করবে।

পরামর্শ পরিষদ ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বিরোধ ও মতবৈষম্য হলে

পরামর্শ পরিষদ বা পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে মতবৈষম্য সৃষ্টি হতে এবং তদ্দরুন বিরোধ দেখা দিতে পারে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাহলে এরূপ অবস্থায় তার মীমাংসার উপায় ও পন্থা কি হতে পারে? ... এর মীমাংসার পথ ও পন্থা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج

www.icsbook.info

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ○ - النساء : ٥٩

"হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করো, অনুসরণ করে চলো রসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তাদেরও। অনন্তর তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধে নিমজ্জিত হও, তাহলে সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। বস্তুত এ নীতিই অতীব কল্যাণময় এবং পরিণামের দিক দিয়েও তা অতীব উত্তম।"

এ আয়াত অনুযায়ী যাবতীয় বিরোধীয় বিষয়কে আল্লাহর কিতাব ও রসূল স.-এর সুন্নাতের দৃষ্টিতে পুনর্বিবেচনাক্রমে চূড়ান্ত ফায়সালা করতে হবে। সব তাফসীরকারই একথা বলেছেন। অতএব কুরআন কিংবা হাদীসে কোনো বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ বা ঘোষণা পাওয়া গেলে, তা মেনে নেয়া ও তদনুযায়ী কাজ করা ওয়াজিব। এর বিপরীত কারোর কথা মানা যেতে পারে না। আর যদি কোনো সুস্পষ্ট হুকুম না-ই পাওয়া যায়, তাহলে যে মত কুরআন ও সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী, তা-ই গ্রহণ ও তদনুযায়ী আমল করতে হবে।–তাফসীরে তাবারী, ৫ম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা ; তাফসীরে কুরতুবী, ৫ম খণ্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা ও আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ২য় খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা।

কিন্তু কোন্ মতটি কুরআন ও সুন্নাতের নিকটবর্তী, তাও যদি জানা না যায় বা তাও যদি নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তখন কি করা যাবে ? এ পর্যায়ে তিনটি পন্থার যে কোনো একটা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

প্রথম পন্থা ঃ শালিস নিয়োগ

এ পর্যায়ের প্রথম পন্থা হলো, ফিকাহবিদ, উত্তম সুস্থজ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন এবং রাষ্ট্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একটা বিশেষ সংস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। তাদের স্বতন্ত্র মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা দিতে হবে এবং তাদের ওপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করা চলবে না। বস্তুত পরামর্শ পরিষদ ও রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে তার চূড়ান্ত মীমাংসার এ-ই হতে পারে এক সুস্পষ্ট কর্মনীতি। অবশ্য এরূপ শালিস নিয়োগ করা হলে তাদের রায় মেনে নেয়া উভয় পক্ষের বাধ্যতামূলক হবে। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা এ পন্থার সুষ্ঠুতা নির্দেশ করে। একবার তিনি সিরিয়া রওয়ানা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি

www.icsbook.info

জানতে পারলেন যে, সেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন সেখানে যাওয়া উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে সঙ্গী মুহাজির মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা একমত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেন না। অতপর তিনি তাঁর সঙ্গী আনসার মুসলমানদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁদের মাঝেও মতবিরোধ দেখা দিলো। তখন তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মুহাজির কুরাইশদের যেসব বৃদ্ধ ও অধিক বয়স্কলোক সাথে ছিলেন, তাঁদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা সবাই বললেন, ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখন তাঁদের এ মত অনুযায়ী-ই আমল করা হলো।–তাফসীর আল মানার, ৫ম খণ্ড, ১৯৪-১৯৭ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পন্থা ঃ সংখ্যাগুরুর মত মেনে নেয়া

এ পন্থার দৃষ্টিতে পরামর্শ পরিষদের অধিকাংশ যে মত পোষণ করে, সেই মতকেই মেনে নেয়া যেতে পারে, যদি তা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের মতের বিপরীতও হয়। এ মতের সমর্থনে বলা যায়, নবী করীম স. উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের মুকাবিলা করার জন্যে মদীনার বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং তখন তিনি অধিকাংশ লোকের মতই গ্রহণ করেছিলেন, যদিও মদীনার বাইরে গিয়ে প্রতিরোধ করার প্রতি তাঁর নিজের তেমন কোনো ঝোঁক ছিলো না। আর বস্তুতই এটা দোষের কিছু নয়। কেননা, সমাজের অধিকাংশ লোকই তাদের সামগ্রিক ব্যাপারে যা চিন্তা করে তা নির্ভুল হবে বলেই ধারণা করা যায়, যদিও নিশ্চয়তা কিছু নেই। কেননা, অনেক এ-ও দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ লোক যা বলেছে, তা ভুল। আর নির্ভুল সত্য হলো তা, যা অল্পসংখ্যক লোকেরা প্রকাশ করে।

তৃতীয় পন্থা ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের নিজের মত গ্রহণ

তৃতীয় পন্থা এ হতে পারে যে, রাষ্ট্রপ্রধান সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে পরামর্শ করবে, বেশীর ভাগ লোক কি বলছে তাও তার সামনে উদঘাটিত হবে এবং কম লোকের মতও জানা যাবে। অতপর সে এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা-ই মেনে নেয়া হবে। সংখ্যাগুরুর ও সংখ্যালঘুর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এ পন্থার কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ তাআলা নবী করীম স.-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ج فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○ - ال عمران : ١٥٩

www.icsbook.info

"তুমি লোকদের সাথে পরামর্শ করো। অতপর তুমি যখন সিদ্ধান্তে পৌঁছবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দেবে।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

কাতাদাহ তাবেয়ী বলেছেন ঃ

امر الله تعالى نبيه عليه السلام اذا عزم على امر ان يقضى فيه ويتوكل على الله لاعلى مشاورتهم - تفسير قرطبى -

"আল্লাহ তাঁর নবীকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করে তা করে যেতে এবং এ ব্যাপারে লোকদের পরামর্শের ওপর নয়—মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিয়েছেন।"–তাফসীরে কুরতুবী

এ পর্যায়ে একথাও মনে রাখতে হবে যে, মূলত রাষ্ট্রপ্রধানই জনগণের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল এবং তার কাজের জন্য জবাবদিহি তাঁকেই করতে হবে। কাজেই ইজতিহাদী ব্যাপারে তাঁকে কর্মের স্বাধীনতা দিতে হবে, অবশ্য যদি তা শরীয়তের অকাট্য নীতি ও আইনের বিপরীত কিছু না হয়। আর মানুষের জবাবদিহি করতে বাধ্য হওয়ার অর্থই হলো তাকে কর্মের স্বাধীনতা দেয়া ; যেন সে নিজের মত ও রায় অনুযায়ী কাজ করতে পারে। কিন্তু তাকে যদি অপরের মতেই কাজ করতে হয়, তাহলে তার জবাবদিহির কথা-ই অর্থহীন হয়ে যায়। কাজ হবে অপরের মতের ভিত্তিতে, আর জবাবদিহি করতে হবে রাষ্ট্রপ্রধানকে একথাটিও তো অযৌক্তিক।

আমরা কোন্ পন্থা গ্রহণ করতে পারি

যদিও বাহ্যত এ শেষোক্ত পন্থাটি অধিক কার্যকর, সহজসাধ্য এবং নির্ভুল মনে হয় ; কিন্তু তবু নানা কারণে এ মতটি গ্রহণ করা সমীচীন হতে পারে না। কেননা রাষ্ট্রপ্রধানকে এভাবে কাজ করার সুযোগ দিলে সে চরম স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? আর একবার যদি কোনো রাষ্ট্রনায়ক স্বেচ্ছাচারিতা করার সুযোগ পায়, তাহলে জনমতের ভিত্তিতে কোনো কাজ সম্পন্ন হবে কোনো দিন তার আশা করা যায় না। তাই দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করা-ই অধিকতর কল্যাণকর। অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান পরামর্শ পরিষদের অধিক সংখ্যক সদস্যদের মত অনুসারে কাজ করবে। অবশ্য এজন্যে কয়েকটি শর্ত অপরিহার্য ঃ (১) রাষ্ট্রপ্রধান যদি অধিকাংশ লোকদের মতকে যথেষ্ট মনে না করেন তাহলে তাকে কোনো তৃতীয় পক্ষ বিচারকের—নিরপেক্ষ শালিসের কাছে বিরোধীয় বিষয়টি সম্পর্কে মীমাংসার জন্যে পেশ করবে। (২) এরূপ কোনো নিরপেক্ষ সংস্থার মীমাংসাকেও যদি যথেষ্ট মনে করা না হয়,

www.icsbook.info

তাহলে এ বিরোধীয় বিষয়টিকে নিয়ে গণভোট গ্রহণ করা যেতে পারে। জাতির জনগণ যদি রাষ্ট্রপ্রধানের মতের প্রতি সমর্থন জানায় তাহলে তার মতকেই গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার বিপরীত হয়, যদি রাষ্ট্রপ্রধানের মতকে জাতির জনগণ প্রত্যাখান করে, তাহলে রাষ্ট্র প্রধান হয় জনগণের মতকে মেনে নিবে, না হয় পদত্যাগ করবে। (৩) রাষ্ট্রপ্রধানকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, যেমন যুদ্ধ কিংবা কঠিন কোনো জাতীয় সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কারো মত মানতে বাধ্য না করে তার নিজের মতেই কাজ করার স্বাধীনতা তাকে দেয়া হবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনার অধিকার ও দায়িত্ব

রাষ্ট্রপ্রধানের কাজকর্মের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং সেই সাথে রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তিদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা সামগ্রিকভাবে গোটা জাতির এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকের একান্ত কর্তব্য, এটা একটা বড় দায়িত্বও বটে। কেননা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে তাদের যে সম্পর্ক, তাতে এরূপ দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখাই হলো তার স্বাভাবিক দাবী। আর সে সম্পর্ক হচ্ছে 'উকীল' হওয়ার সম্পর্ক। জাতি সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রপ্রধানকে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যসম্পাদনের জন্যে 'উকীল' নিয়োগ করে। জাতি এবং জাতির ব্যক্তিগণ হয় তার 'মুয়াক্কিল'। আর প্রত্যেক মুয়াক্কিলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তার উকিলের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। অন্যথায় উকীল যেমন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, তেমনি সে 'মুয়াক্কিলের' মর্জীর বিপরীত কাজও করে বসতে পারে।

বিশেষত রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলামী আদর্শের বিপরীত কোনো কাজ করে তখন তার প্রতি এরূপ দৃষ্টি রাখা সর্বাধিক কর্তব্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানকে সঠিক পরামর্শ দান, সদুপদেশ দান, তার ভুল-ভ্রান্তি তার সামনে স্পষ্টভাবে বলে দিয়ে তাকে সংশোধন করা এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা জাতির ও জাতির ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য। বস্তুত এ কাজ যদি সঠিকরূপে পালন করা না হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের মারাত্মক ভুল করে বসার আশংকা রয়েছে। সে এতোখানি বিগড়ে যেতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত সে গোটা জাতি ও রাষ্ট্রকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে। এজন্যে হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন ঃ

الدين النصيحة قلنا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم - رواه مسلم

www.icsbook.info

"দীন হচ্ছে নসীহত। আমরা বললাম ঃ কার জন্যে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, মুসলিম (রাষ্ট্রীয়) নেতাদের জন্যে এবং মুসলিম জনগণের জন্যে।"–মুসলিম শরীফ

এভাবে নসীহতের পরও যদি কোনো শুভ ফলোদয় না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানকে ঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। জোর করে তাকে যুলুমের পথ থেকে, অন্যায় পথ থেকে এবং সর্বপ্রকারের বিপদ থেকে বিরত রাখা জাতির কর্তব্য। এ পর্যায়ে নবী করীম স.-এর নির্দেশ হলো ঃ

والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن على يد الظالم ولتاطرنه على الحق اطارا ولتقصرنه على الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم - رواه ابو داؤد

"আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে। অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। যালেমের হাত শক্ত করে ধরে রাখবে, সত্য নীতির ওপর স্থির করে রাখবে এবং তাকে সত্য কাজ করতেই বাধ্য করবে। অন্যথায় মনে রাখবে, আল্লাহ তোমাদের মনকে পরস্পরের প্রতি খারাপ করে দেবেন। আর শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের মতো অভিশপ্ত করবেন।"–আবু দাউদ

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان الناس اذ راو الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله تعالى بعقاب منه - رياض الصالحين

"লোকেরা যখন যালেমকে যুলুম করতে দেখবে, তখন যদি তারা তার দু'হাত শক্ত করে না ধরে রাখে তাহলে আল্লাহর আযাব সাধারণভাবে সবাইকে গ্রাস করতে পারে।"–রিয়াদুস সালেহীন

রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রের অপরাপর দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার অধিকার একটা জাতীয় অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রে এ অধিকার পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলরা এ অধিকারের পূর্ণ প্রয়োগের জন্যে জনগণকে আহ্বান জানাতো। ইতিহাস এ পর্যায়ের অনেক ঘটনাকেই তার পৃষ্ঠায় স্থান দিয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. খলীফা নির্বাচিত হয়ে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ঃ

www.icsbook.info

فان احسنت فاعينونى وان زغت فقومونى

"আমি ভালো করলে তোমরা সবাই আমার সহযোগিতা করবে। আর আমি যদি বাঁকা পথে চলতে শুরু করি, তাহলে তোমরা আমাকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করবে।"–তাবকাতে কুবরা, ইবনে সায়াদ, ৩য় খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রা.-এর এক ভাষণে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

من راى منكم فى اعوجا فليقومه ـ

"তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার মধ্যে কোনোরূপ বক্রতা লক্ষ্য করলে তা দূর করে দেয়া তার কর্তব্য।"

তখন উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলো ঃ

فقال له احد الحاضرين : والله لو راينا فيك اعواجا لقومناه بسيوفنا ـ

"আল্লাহর কসম, তোমার মধ্যে কোনোরূপ বক্রতা দেখতে পেলে আমরা তোমাকে আমাদের তরবারির সাহায্যেই ঠিক করে রাখবো।"

একথা শুনে দ্বিতীয় খলীফা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন ঃ

الحمد لله الذى جعل فى امة محمد من يقوم عمر بسيفه

"আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ স.-এর উম্মাতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যারা তাদের তরবারির দ্বারা ওমরকে ঠিক পথে চালাতে পারে এজন্যে আল্লাহর লাখো শোকর।"

রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতি

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগত মর্যাদা হলো, সে হচ্ছে জাতির উকিল—জাতির সামগ্রীক কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্যে দায়িত্বশীল। এই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন রাষ্ট্রপ্রধান তার দায়িত্ব বিরোধী কোনো কাজ করলে অথবা অক্ষমতা বা উপেক্ষার দরুন তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তাকে পদচ্যুত করার অধিকার জাতিকে অবশ্যই দিতে হবে। যে নিয়োগ করতে পারে সে বহিষ্কৃতও করতে পারে এটাই তো স্বাভাবিক! আর জাতির জনগণই রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করে, কাজেই তাকে পদচ্যুত করার অধিকারও জাতিরই থাকতে হবে। ইসলামী শরীয়তেও জনগণের এ অধিকার স্বীকৃত। আর ফিকাহর কিতাবে এ অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত। এ অধিকারের ভিত্তি হলো ঃ দায়িত্বের সীমালংঘন এবং দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা। ফিকাহবিদগণ তাই লিখেন ঃ

www.icsbook.info

وللامة خلع الامام وعزله بسبب يوجبه مثل ان يوجد منه ما يوجب اختلال احوال المسلمين وانتكاس امور الدين كما كان لهم نصبه واقامته لانتظامها اعلائها ـ المواقف، النظرية السياسة الاسلامية

"উপযুক্ত কারণে রাষ্ট্রপ্রধানকে পদচ্যুত করার অধিকার জাতির রয়েছে। সে কারণের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া এবং দীনের ব্যাপারটি লংঘিত বা উপেক্ষিত হওয়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও তার উন্নয়নের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়োগ করাও যেমন তাদেরই অধিকার ছিলো, এও তেমনি।"

–আল মাওয়াকিফ, আন্ নযরীয়াতুস সিয়াসাতুল ইসলামীয়া।

আর প্রখ্যাত ফিকাহ ও রাজনীতিবিদ ইমাম ইবনে হাজাম আন্দালুসী রাষ্ট্রপ্রধান প্রসংগে লিখেছেন ঃ

فهو الامام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب اللّه تعالى وبسنة رسوله ﷺ فان زاغ عن شيء منهما منع من ذالك واقيم عليه الحد والحق فان لم يؤمن اذاه الابخلعه خلع ولولى غيره ـ

"রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে চলা ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সে জনগণকে আল্লাহর কিতাব ও রসূল স.-এর সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত করবে। সে যদি তা থেকে একবিন্দু ভিন্ন পথে ধাবিত হয়, তাহলে তাকে সে পথ থেকে বিরত রাখা হবে এবং তার ওপর শরীয়তের অনুশাসন কার্যকর করা হবে। আর তাকে পদচ্যুত না করা হলে তার দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকা যাবে না মনে করা হলে তাকে পদচ্যুত করা হবে এবং তার স্থানে অপর একজনকে নিয়োগ করা হবে।"

পদচ্যুত করার নিয়ম

রাষ্ট্রপ্রধানকে পদচ্যুত করার যখন জাতির অধিকার রয়েছে, তখন এ কাজ তার সমকক্ষ লোকদের দ্বারা সম্পন্ন করানোই যুক্তিযুক্ত, তার সমকক্ষ হচ্ছে, 'আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ'। তারা শক্তভাবে ব্যাপারটিকে ধারণ করবে এবং এ পদচ্যুতির কাজটিকে বাস্তবায়িত করবে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি তাদের কথা মেনে নিতে রাজী না হয়, তাহলে এরূপ অবস্থায় তাকে পদচ্যুত করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করা অবশ্যই বৈধ হবে। অবশ্য এ শক্তি প্রয়োগের জন্যে শরীয়তের মজবুত ভিত্তি থাকতে হবে। যেমন ইসলামের মৌল আদর্শ

www.icsbook.info

ও আইন-কানুন লংঘন করলে ইসলামের দৃষ্টিতে এ হবে সুস্পষ্ট কুফরী। আর হাদীসে এ পর্যায়েই ইরশাদ করা হয়েছে, হযরত উবাইদা ইবনে সামেত রা. বলেন ঃ

دعانا النبى ﷺ فبايعناه على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وان لاتنازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان۔

"নবী করীম স. আমাদের ডাকলেন, আমরা তাঁর হাতে বায়আত করলাম। আনন্দ ও দুঃখ, শান্তি ও কষ্ট এবং বিপদ-আপদ সর্বাবস্থায় আমরা তাঁকে মেনে চলবো। আর রাষ্ট্র-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধতা করবো না। তবে যদি তাদের দ্বারা সুস্পষ্ট কুফরী অনুষ্ঠিত হতে দেখো, তাহলে তার সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলীল বর্তমান রয়েছে।"–বুখারী, ৯ম খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রপ্রধানকে শক্তি প্রয়োগে পদচ্যুত করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো ঃ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার আর সাফল্য ও বিজয়ের খুব বেশী সম্ভাবনা থাকতে হবে। অন্যথায় কোনোরূপ নিষ্ফল দুর্ঘটনা ঘটানো কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। কেননা 'ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'—কাজের জন্য জরুরী শর্ত হলো এই যে, একটি অন্যায়কে খতম করতে গিয়ে যেন তার চেয়েও বড় অন্যায় সৃষ্টির কারণ না ঘটানো হয়। এজন্যে যে, তাতে করে অনাহুতভাবে শুধু রক্তপাতই করা হবে, দেশ ও জনগণের জীবনে তা কোনো কল্যাণই সৃষ্টি করতে পারবে না। আর ইসলামের দৃষ্টিতে অকারণ রক্তপাত ও জনজীবন বিপর্যস্ত করা সবচেয়ে বড় অন্যায় ও অপরাধ।

পঞ্চম ঃ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার

ব্যক্তির পদপ্রার্থী হওয়ার অধিকার ঃ রাষ্ট্রের কোনো পদ বা সর্বসাধারণের কাজের বা কোনো বৃত্তির জন্যে প্রার্থী হওয়া—নিজেকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করানোর অধিকার ব্যক্তির আছে কি?... থাকা উচিত কি? একথা নিসন্দেহ যে, এরূপ করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রে নেই—থাকা উচিতও নয়। ইসলামী শরীয়তে এ একটা সাধারণ নিয়ম। সহীহ হাদীসে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. তাঁকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন ঃ

www.icsbook.info

يا عبد الرحمن بن سمرة لاتسال الامارة فان اعطيتها عن مسالة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسالة اعنت عليها ـ

"হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য প্রার্থী হবে না। প্রার্থী হওয়ার দরুন যদি তোমাকে কোনো পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তোমাকে তাতেই সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি প্রার্থী না হয়েও তুমি তেমন কোনো পদে নিযুক্ত হও, তাহলে সে দায়িত্ব পালনে তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে।"

—বুখারী, ৯ম জিলদ, ১১৪ পৃষ্ঠা।

কোনো প্রার্থী হওয়ার মানে তুমি পদ চাও ; পদাধিকারী হওয়ার জন্যে তোমার মনে খাহেশ জেগেছে। কর্তৃত্বের জন্যে লোভ জেগেছে, আর ইসলামী শরীয়তে তা জায়েয নয়।

কিন্তু কোনো পদের জন্যে অন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা শরীয়তে সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, তাতে নিজের কোনো খাহেশ বা লোভের প্রশ্রয় থাকে না। এতে বরং জাতির দৃষ্টি কোনো যোগ্য ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ করা হয়। আর তা শুধু জায়েযই নয়, কর্তব্যও।

বর্তমানকালে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপার

ব্যক্তির নিজের প্রার্থী হওয়া শরীয়তে অবৈধ একথা যেমন ঠিক, একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবেই তা অনুসরণীয়, ঠিক তেমনি যদি প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা করা কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে তখন তা আর নাজায়েয হতে পারে না। আর বর্তমানকালে অনেক সময় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলো এমন জটিল হয়ে দেখা দিয়ে থাকে যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী হয়ে না দাঁড়ালেও আবার চলে না। জনসাধারণকে ভালোভাবে জানতে হবে যে, সমাজের মধ্যে কোন্ লোকেরা সত্যিই নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। তা না জানতে পারলে জনসাধারণ নিজেদের থেকে যোগ্যতম লোকদের নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে না। অথচ যাবতীয় রাষ্ট্রীয় পদে সমাজের সর্বোত্তম ও অধিক যোগ্য লোকদের নির্বাচিত করা একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় কঠিন ও জটিল ব্যাপারগুলো যথাযথভাবে আনজাম পেতে পারবে না। এরূপ অবস্থায় এক ব্যক্তির নিজেকে কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্যে জনগণের সামনে পেশ করার অর্থ হবে জনগণকে জানিয়ে দেয়া ও কি ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে তা বুঝিয়ে দেয়া এবং সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার সুযোগ করে দেয়া।

www.icsbook.info

অবস্থা যদি সত্যিই এরূপ হয়, তাহলে এভাবে ব্যক্তির প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারটি অবৈধ বলে কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে না। এরূপ জাতীয় সংকটের অবস্থায় যোগ্য ব্যক্তিকে যে, জনগণের সামনে নিজেকে প্রার্থীরূপে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন রয়েছে, তা হযরত ইউসুফ আ.-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি মিসর দেশের এমনি এক সংকটকালে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ج اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ - يوسف : ٥٥

"আমাকে দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদের ওপর দায়িত্বশীল বানিয়ে দাও, আমি অধিক সংরক্ষণকারী ও বিষয়টি সম্পর্কে অধিক অবহিত।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫

হযরত ইউসুফ আ.-এর মনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লোভ ছিলো, এমন কথা কিছুতেই ধারণা করা যায় না। নিশ্চয়ই অবস্থার জটিলতা নিরসনের উদ্দেশেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যেমন রাষ্ট্রীয় সংকট দূর করে সুষ্ঠু পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা করা, তেমনি রাষ্ট্রশক্তিকে আল্লাহর মর্জী মতো পরিচালিত করা। আর এ এমন একটা ব্যাপার, যা বর্তমানের যে কোনো রাষ্ট্র ব্যক্তিগত প্রার্থী হওয়াকে বৈধ করে দেয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত প্রার্থী হওয়া অবস্থার জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ হলেও কোনো প্রার্থীর পক্ষেই কেবল নিজের প্রচার ও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি জায়েয হতে পারে না। প্রার্থীর জন্যে বৈধ শুধু এতোটুকু যে, সে নিজের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শকে প্রচার করবে। সে রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচিত হলে রাষ্ট্র ও জনগণের জন্যে শরীয়তের ভিত্তিতে কি কি কল্যাণ সাধন করবে, তা-ই শুধু সে প্রচার করবে, এর বেশী কিছু নয়।

বর্তমান সময়ে যেমন প্রার্থী হওয়ার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দিতে পারে, তেমনি নিছক ব্যক্তিগত প্রার্থী হওয়ার পথ থেকে দূরে থাকাও সম্ভব হতে পারে। আর তার উপায় হলো দলীয় ভিত্তিতে প্রার্থী দাঁড় করানো নীতি অনুসরণ। এতে করে যেমন ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হওয়া সম্পর্কে রসূলে করীম স.-এর নিষেধকে মান্য করা যায়, তেমনি হযরত ইউসুফ আ.-এর আদর্শও অনুসৃত হতে পারে।

সরকারী চাকরিতে ব্যক্তিগত প্রার্থী হওয়ার রীতি

সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তিরই নিজস্বভাবে প্রার্থী হওয়ার রীতি ইসলামী শরীয়তের সমর্থিত নয়। এরূপ করার কোনো

www.icsbook.info

অধিকার ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি। আসলে এ কাজটি সম্পন্ন হওয়া উচিত সরকারের নিজস্ব উদ্যোগক্রমেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. বলেন ঃ

"আমি রসূলে করীম স.-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমার সাথে আমার দু'জন চাচাতো ভাইও সেখানে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার ক্ষমতাধীন কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমাকে নিযুক্ত করুন। অপরজনও এরূপ কথা বললো। তখন নবী করীম স. ইরশাদ করলেন ঃ আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এ রাষ্ট্রীয় কাজে আমি এমন কোনো লোককে নিয়োগ করবো না, যে তা পেতে চাইবে কিংবা সে জন্যে লোভ করবে।"÷তাইসীরুল উসূল, ১ম খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা গেল, সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভের কোনো অধিকার জনগণের নেই। কেননা যদি এ অধিকার থাকতোই, তাহলে তা পেতে চাওয়া থেকে বিরত রাখার কোনো কারণ থাকতে পারে না। বস্তুত এটা ব্যক্তির অধিকার নয় সরকারের ওপর, বরং সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যক্তির প্রতি।

তাহলে সরকার জনগণকে এ পদে কি করে নিয়োজিত করবে ? এখানেই সরকারের দায়িত্বের প্রশ্ন। সরকার প্রত্যেকটি কাজের জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে যাচাই-বাছাই করার একটা পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। এজন্যে প্রত্যেক পদেই একটি বিশেষ পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। সে পরীক্ষায় যারা অধিক যোগ্য প্রমাণিত হবে, কোনোরূপ প্রার্থী হওয়ার রীতি অনুসরণ ছাড়াই সেই যোগ্য লোকদের নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে এ পর্যায়ে হাদীসে যোগ্যতার সনদ ছাড়া অন্য কোনো কারণে আত্মীয়তা, স্বজনপ্রীতি, বন্ধুত্বতা, খাতির বা ঘুষ ইত্যাদি কোনো কিছুর দরুন কাউকে কোনো পদে নিয়োগ করা কিছুতেই উচিত নয়। নবী করীম স. স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ঃ

من ولى من امر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان اللّه ورسوله ـ

"যে লোক মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল হবে, সে যদি কোনো অধিক যোগ্য মুসলমানদের পরিবর্তে অপর কোনো ব্যক্তিকে সরকারী কোনো চাকরিতে নিয়োগ করে, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।"–আস-সিয়াসাতুশ শারয়ীয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ৪ পৃষ্ঠা।

www.icsbook.info

এভাবে প্রত্যেকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ করাই যখন সরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, তখন যোগ্যতার মাপকাঠিকে সামনে তুলে ধরা একান্ত জরুরী। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতার মান কি ?—বলা যায়, তাহলো শক্তি, কর্মক্ষমতা ও কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা। কুরআন মজীদের একটি আয়াত থেকে এ মানদণ্ডের কথাই জানতে পারা যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ - القصص : ٢٦

"তোমার পক্ষে উত্তম শ্রমিক হতে পারে সে-ই, যে লোক শক্তি সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত।"–সূরা আল কাসাস ঃ ২৬

এখানে শক্তি অর্থ নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং তা কাজের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ যেমন কাজ ঠিক তেমন—সেই কাজ সুষ্ঠুরূপে আনজাম দেয়ার যোগ্য হতে হবে।

আর আমানত শব্দটি বুঝায়, কাজ ও দায়িত্বটির প্রতি ঠিক যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, যতখানি গুরুত্ব পাওয়া বাঞ্ছনীয় শরীয়তের দৃষ্টিতে, তার সাথে ঠিক সেরূপ আচরণ করা এবং তাকে ঠিক সেরূপই গুরুত্ব আরোপ করা। আর আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ভয় মনে স্থান দিয়ে সে কাজকে অনুরূপভাবে আনজাম দেয়া। কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে লোকভয় বা কোনোরূপ ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থপরতাকে একবিন্দু প্রশ্রয় না দেয়া।

আধুনিক যুগে যোগ্য লোক নিয়োগের উপায়

একদিকে শরীয়তে পদপ্রার্থী হওয়া অবাঞ্ছনীয়, অপরদিকে প্রত্যেকটি কাজের জন্যে যোগ্য লোক সন্ধান করা সরকারী দায়িত্ব। বর্তমান যুগে এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপনের পন্থা কি হতে পারে ?

জবাবে বলা যায়, কাজের গুরুত্বের দৃষ্টিতে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সরকারের কতকগুলো কাজ থাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পর্যায়ের, যাতে ব্যক্তির ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকে, থাকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভের অবকাশ। যেমন মন্ত্রীগণ, সেনাধ্যক্ষ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। এসব কাজের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধানকে নিজ থেকেই উপরোক্ত গুণদ্বয়ের দৃষ্টিতে যোগ্য লোক সন্ধান করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য হাজার হাজার সরকারী পদের জন্যে লোক নিয়োগের কাজ সম্পাদনের জন্যে লোকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা ছাড়া কোনো উপায় দেখা যায় না। এজন্যে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা যেতে পারে এবং

www.icsbook.info

বিভিন্ন কাজের জন্যে লোক সন্ধান করার দায়িত্ব এ বিভাগের ওপর অর্পণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ বিভাগ থেকে বাছাই করা যোগ্য লোক নিয়োগের জন্যে রসূলে করীম স.-এর এ হাদীস অনুযায়ী নির্দেশ দিতে হবে ঃ

اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قيل وكيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهله-

"দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদি যখন বিনষ্ট হতে থাকে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করো। জিজ্ঞেস করা হলো, কেমন করে তা বিনষ্ট হতে পারে ? রসূলে করীম স. বললেন, দায়িত্বপূর্ণ কাজ যখন কোনো অযোগ্য লোকের উপর ন্যস্ত করা হয়, তখন তা বিনষ্ট হওয়ার অবস্থা দেখা দেয়।"–তাইসীরুল উছুল, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

www.icsbook.info

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার বলতে কি বুঝায় ?

মৌলিক অধিকার বলতে বুঝায় এমন সব অধিকার, যা সমাজের লোক হিসাবে জীবন যাপনের জন্যে একজন মানুষের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। যা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়, উচিত নয়। এ অধিকারগুলো নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে, ব্যক্তির নিজের প্রাণ সংরক্ষণ, তার আযাদী এবং তার ব্যক্তিগত সম্পদ-সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এ অধিকারগুলো যথাযথরূপে সংরক্ষিত না হলে মানুষের মানবিক মর্যাদা অরক্ষিত ও বিপন্ন হতে বাধ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ অধিকারগুলোকে দুটো বড় বড় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম–সাম্য ও সমতা, দ্বিতীয়–আযাদী বা স্বাধীনতা। সমতা বা সাম্য কয়েক ভাগে বিভক্ত। তাহলো ঃ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, বিচারের ক্ষেত্রে সাম্য ও সমতা। আযাদীও এমনিভাবে কয়েক ভাগে বিভক্ত। তাহলো ঃ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মালিকানা অর্জন ও রক্ষণের স্বাধীনতা, বাসস্থান অর্জনের ও গ্রহণের স্বাধীনতা, আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত-উপাসনার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের ও শিক্ষার স্বাধীনতা।–আদ দিমোক্রাতিয়াতুল ইসলামিয়া লিদ দাক্তুর উসমান খলীল, ২৩ পৃষ্ঠা।

আলোচনার পদ্ধতি

ইসলামী শরীয়ত প্রদত্ত জনগণের সাধারণ অধিকারসমূহ সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হবো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ অধিকারগুলোকে যেভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, আমরা বিষয়টিকে ঠিক সেভাবে ভাগ করেই আলোচনা করতে চাই। ইসলামের ছত্রছায়ায় এ অধিকারগুলো সাধারণ মানুষ কিভাবে এবং কতখানি উপভোগ করতে পারে, তা বিশ্লেষণ করাই হলো আমাদের এ আলোচনার লক্ষ্য। এজন্যে আমরা বিষয়টিকে মৌলিকভাবে দু' পর্যায়ে ভাগ করবো। প্রথমে আমরা সাম্য ও সমতা সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং পরে আযাদী বা স্বাধীনতা সম্পর্কে।

সাম্য ও সমতা

ইসলামী শরীয়তে সাম্যের গুরুত্ব ঃ ইসলামী শরীয়তে সাম্য ও সমতার গুরুত্ব বিরাট। সব মানুষ মৌলিকভাবেই সমান বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে।

www.icsbook.info

ইসলাম মূলের দিক দিয়েই সব মানুষের মাঝেও অভিন্ন সাম্য কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে পার্থক্য হতে পারে কেবল নেক আমল ও কল্যাণকর কার্যক্রমের ভিত্তিতে। আল্লাহ তাআলা একথাই ঘোষণা করেছেন কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط ـ الحجرت : ١٣

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও স্ত্রী থেকে। আর তোমাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের পারস্পরিক পরিচিত লাভের জন্যে। তবে আসল কথা হলো, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী সম্মানার্হ, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

এ আয়াত স্পষ্ট বলছে, মানুষ মৌলিকভাবেই এক, অভিন্ন ও সর্বতোভাবে সমান। মানুষ হিসাবে তাদের মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই। আর মানুষকে যে বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী ও বংশ সম্ভূত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও নিসম্পর্ক করে দেয়া নয়, বরং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের পারস্পরিক পরিচিতি লাভ ও পারস্পরিক সহযোগিতার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। এসব জিনিসের ভিত্তিতে পরস্পর গৌরব-অহংকার করা এবং নানাভাবে পার্থক্য ও ভেদাভেদের পাহাড় খাড়া করা কখনো এর উদ্দেশ্য নয়, তা করা জায়েযও নয় কারোর জন্যে। এর ভিত্তিতে কেউ কারোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে না। বস্তুত ইসলামের এ মহান আদর্শ মানব সমাজ থেকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের মূলকেই উৎপাটিত করে দিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে সব বংশীয় ও বর্ণীয় গৌরব অহংকার। অতপর প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি মানুষের মাঝে পার্থক্য ও তারতম্য করার কোনো ভিত্তিই নেই ? পার্থক্য করার বস্তুনির্ভর কোনো ভিত্তি যে নেই তা চূড়ান্ত। ইসলাম এ পার্থক্যের একটি ভিত্তিই শুধু উপস্থাপিত করেছে এবং তা এমন, যা মানুষের নিজস্ব গুণ ও ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে অর্জন করতে পারে, যে কোনো মানুষ তা লাভ করতে পারে। তার পথে কোনো বংশগত বা অর্থ-সম্পদগত মর্যাদা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

বস্তুত ইসলামী শরীয়তে সাম্য ও সমতার শিকড় অতি গভীরে নিবদ্ধ। শরীয়তে যাবতীয় বিধি-বিধান ও আইন-কানুনেই এ সাম্য পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা এখানে এ পর্যায়ের কয়েকটি দিকের উল্লেখ

www.icsbook.info

করছি। এর মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও বিচার-ব্যবস্থায় সাম্যের দিকটি সবচেয়ে বেশী উল্লেখ্য।

আইনের দৃষ্টিতে মানুষের সাম্য ঃ আইনের দৃষ্টিতে মানুষের সাম্য, সাম্যের এক পরম প্রকাশ। ইসলাম যে সুবিচার নীতি উপস্থাপিত করেছে এ তারই চূড়ান্ত রূপ। ইসলামে আইন সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে কোনোরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, না বংশের দিক দিয়ে না বর্ণ, ভাষা ও সম্পদ পরিমাণের ভিত্তিতে। এমনকি আকীদা, বিশ্বাস, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদির কারণেও আইন প্রয়োগে মানুষের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা চলবে না। হাদীসে নবী করীম স.-এর এ ঘোষণাটি এক বিপ্লবী ঘোষণা হিসাবেই উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

انما اهلك الذين من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد - وايم اللّه لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها -

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে কেবল এ বিভেদ নীতির ফলে যে, তাদের সমাজের 'ভদ্রলোকেরা' যখন চুরি করতো, তখন তাদের কোনো শাস্তি দেয়া হতো না। পক্ষান্তরে তাদের মাঝে দুর্বল লোকেরা যখন চুরি করতো, তখন তারা তাদের ওপর কঠোর অনুশাসনই চাপিয়ে দিতো। আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, তাহলে তার হাতও কেটে দেয়া হবে।"–তাফসীরুল উসূল, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের গুরুত্ব ঃ বস্তুত জনসম্পদে এরূপ নির্বিশেষে সমতা বিধানের ফলেই রাষ্ট্রের জনগণ সন্তোষ এবং নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে। তারা কার্যত দেখতে পায় যে, এখানে কারোর প্রতিই কোনোরূপ অবিচার বা যুলুম করা হয় না, করা হয় না কারোর প্রতি একবিন্দু পক্ষপাতিত্ব, এখানে নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার পূর্ণ মাত্রায় সংরক্ষিত হয়। তখন তারা রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করে। এ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু এ সাম্য যদি কখনোও লংঘিত হয় আর আইন যদি কেবল দুর্বলদের ওপরই কার্যকর হতে থাকে, তখন জনগণ এ রাষ্ট্র সম্পর্কে চরম নৈরাশ্য পোষণ করতে শুরু করে। রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি তাদের মনে থাকে না কোনোরূপ আন্তরিকতা। তখন তারা এর স্থিতি ও প্রতিরক্ষার জন্যে কোনোরূপ ত্যাগ

www.icsbook.info

স্বীকার করতেও প্রস্তুত হয় না। আর এর ফলেই জনগণের উপর যুলুম হতে শুরু হয়। এখানে কেবল শক্তিশালীদেরই কর্তৃত্ব চলে। শক্তিই হয় চূড়ান্ত ফায়সালাকারী, আইন নয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' এ-ই হয় এখানকার অবস্থা সম্পর্কে সঠিক কথা। আর কোনো রাষ্ট্র যখন এ অবস্থায় পৌছে যায়, তখন তার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এজন্যে আরবী ভাষায় একথাটি প্রচলিত হয়েছেঃ

تبقى الدولة العادلة وان كانت كافرة وتفنى الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة -

"সুবিচারকারী রাষ্ট্র কাফের হলেও টিকে থাকে আর যালেম রাষ্ট্র মুসলিম হলেও টিকে থাকে না।"

একটি দৃষ্টান্তঃ 'খলীফায়ে রাশেদ' হযরত ওমর ফারুক রা.-এর খিলাফতের আমলে মিসরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল আছ রা. একজন কিবতী নাগরিককে অকারণে চপেটাঘাত করেছিলেন। কিবতী হযরত ওমর রা.-এর কাছে অভিযোগ করলো। পরে ইবনে আমর যখন খলীফার দরবারে হাযির হলেন, তখন তিনি কিবতীকে হাযির করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমাকে এই লোক মেরেছিলো ? কিবতী বললো, হ্যাঁ, এ লোকই আমাকে অকারণে চপেটাঘাত করেছিলো।" খলীফা বললেন ঃ "তাহলে তুমিও ওকে মারো। এ আদেশ পেয়ে সে ইবনে আমরকে মারতে শুরু করলো। পরে খলীফা ওমর রা. আমর ইবনুল আছকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

متذكم يا عمرو تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا -

"হে আমর! কবে থেকে তুমি লোকদের গোলাম বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের মায়েরাতো তাদের স্বাধীন রূপেই প্রসব করেছিলো ?"

বিচারের ক্ষেত্রে সাম্য ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে দেশের সকল নাগরিকই বিচারের ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। সেখানে যে কোনো লোকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যায় এবং আদালত যে কোনো লোককে বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য করতে পারে। বিচারালয়েও বাদী বিবাদীর মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা চলে না। এমনকি কোনো শত্রুও যদি আদালতের সামনে ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে ঠিক তেমনি আচরণই পাবে যেমন আচরণ পাবে একজন মিত্র বা স্বদেশের নাগরিক। একথাই আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط

www.icsbook.info

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ দাতা হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো। বস্তুত আল্লাহপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮

তিনি আরো স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এ ভাষায় ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط ـ النساء ٥٨

"তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচারকার্য করবে, তখন অবশ্যই সুবিচার করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮

বস্তুত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও বিচারের ক্ষেত্রে সাম্য—এ দুটোই ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খলীফা হযরত ওমর রা. গভর্নর হযরত আবু মূসা আশআরীকে লিখেছেন ঃ

امن بين الناس فى مجلسك وفى وجهاك وقضائك حتى لايطمع شريف ولاييأس ضعيف من عدلك ـ

"তোমরা বৈঠকে, চেহারায় ও বিচারে পূর্ণ সাম্য রক্ষা করবে লোকদের মাঝে, যেন কেউ তোমার দোষ ধরতে না পারে এবং দুর্বল লোকেরা যেন তোমার সুবিচার থেকে নিরাশ হয়ে না যায়।"

–এলামুল মুওয়াওবেকীন, ১ম খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।

বস্তুত ইসলামের এ সাম্যনীতি এতোই উন্নত যে, আধুনিককালে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাও এর সমান হওয়ার দাবী করতে পারে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

ব্যক্তি স্বাধীনতার সংজ্ঞা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে বুঝায়, রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাধীন, অবাধ চলাফেরা ও যাতায়াতের অধিকার, শত্রুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করার অধিকার ; এ অধিকার যে তার মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি অকারণে কেউ হরণ করে নেবে না, কেউ তার ওপর অকারণে অত্যাচার যুলুম করবে না, কেউ তাকে বিনা অপরাধে আটক করবে না। দেশের বৈধ আইন মুতাবিকই সে জীবন যাপন করতে পারবে এবং তার সাথে আইন-সম্মতভাবেই আচরণ করা হবে। সে নিজের ইচ্ছায় দেশের বাইরেও যেতে পারবে, আবার সময় মতো নিজের ঘরেও আসতে পারবে।

www.icsbook.info

শরীয়তে ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ বস্তুত ইসলামী শরীয়তে এ অর্থে ব্যক্তিগত অধিকার পুরামাত্রায় স্বীকৃত। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে কার্যত ব্যক্তিদেরকে এর চেয়েও ব্যাপক ও প্রশস্ততর অধিকার দেয়া হয়েছে। জনগণের ওপর কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করা যুলুম। আর যুলুম ইসলামে চিরদিনের তরে হারাম। এখানে রাষ্ট্র ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার রক্ষার জন্যে দায়িত্বশীল। ব্যক্তি জীবন, দেহ-ইজ্জত-আবরু ও সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখার জন্যে রাষ্ট্র সতত তৎপর হয়ে থাকবে। ইসলামী শরীয়ত একথাই ঘোষণা করেছে স্পষ্ট ভাষায়। এজন্য যুলুমকারীকে শাস্তি ও দণ্ড দিতে রাষ্ট্র একান্তভাবে বাধ্য। শরীয়তে এ শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তিকে কোনোরূপ শাস্তি ভোগের সম্মুখীন হতে হয় তখন, যখন শরীয়তী আইনের প্রকাশ্য বিচারে তার অপরাধ সপ্রমাণিত হবে এবং শাস্তি ঠিক ততটুকুই দেয়া হবে যতটুকু শাস্তি তার অপরাধের জন্যে শরীয়তে বিধিবদ্ধ রয়েছে। এখানে একজনের অপরাধের জন্যে অন্যজনকে শাস্তি ভোগ করতে হয় না। যার অপরাধ, তাকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى - بنى اسرائيل : ١٥

"একজনের বোঝা অপরজন কখনোও বহন করবে না।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫

নিজের ঘরের বাইরে, নিজ দেশের যেখানে-সেখানে এবং দেশের বাইরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করার অধিকারও প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, শরীয়তে এজন্যে রীতিমতো উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মজীদে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط -

"লোকেরা কি যমিনের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণতি হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখবে না ?"

–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯

ব্যবসায়ের জন্যে বিদেশে ভ্রমণ করারও নির্দেশ রয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○- الملك : ١٥

"তোমরা যমীনের পরতে পরতে চলাফেরা করো এবং তার ফলে উপার্জিত রিযিক আহার করো। শেষ পর্যন্ত তারই কাছে ফিরে যেতে হবে তোমাদের সকলকে।"–সূরা আল মুল্‌ক ঃ ১৫

www.icsbook.info

অবশ্য কোনো কারণে কোনো ব্যক্তিকে যদি বাইরে যেতে না দেয়াই আইনসম্মত বিবেচিত হয়, তাহলে সে লোকের যাতায়াতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। হযরত ওমর ফারুক রা. তাঁর খেলাফত আমলে বড় বড় সাহাবীদের মদীনার বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন, যেন রাষ্ট্রীয় জটিল ব্যাপারে সময় মতো তাঁদের সাথে পরামর্শ করা যায়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কারণে যখন এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ সংগত, তখন জাতীয় কল্যাণের দৃষ্টিতেও তা অবশ্যই সংগত হবে।

ব্যক্তির ইজ্জত-আবরু রক্ষা করা সরকারী দায়িত্ব

ব্যক্তির জীবন, দেহ ও সম্পত্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র দায়িত্ব নয়। সেই সাথে ইজ্জত-আবরু রক্ষা করা এবং তা কারোর দ্বারা ক্ষুণ্ন হলে তার প্রতিবিধান করাও সরকারের দায়িত্ব। রাষ্ট্র-সরকার নিজে কাউকে অকারণে অপমান করবে না, কেউ অপমান করলে তা বরদাশতও করবে না। কেননা মুসলিম মাত্রই সম্মানিত ; তাঁর সম্মান চির সংরক্ষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "ইজ্জত-সম্মান সবই আল্লাহ, রসূল এবং সকল মু'মিনদের জন্যে।" অতএব কেউ লজ্জিত বা অপমানিত হোক তা ইসলামী রাষ্ট্র কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের রিসালাত উত্তরকালীন দায়িত্ব পালন করতে পারে কেবলমাত্র স্বাধীন, সম্মানিত ও মর্যাদাবান মুসলমান। এজন্যে ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদার তাৎপর্য শিক্ষা দিতে চেষ্টা করবে এবং যেসব কাজে তা ব্যবহৃত ও ক্ষুণ্ন হয় তার প্রতিরোধ করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। হযরত ওমর ফারুক রা. তাঁর শাসনকর্তাদের বলেছিলেন ঃ

لاتضربوا المسلمين فتذلوهم-

"তোমরা মুসলিম জনগণকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে না, কেননা তাহলে তোমরা তাদের অপমান করলে।"

এজন্যে তিনি হজ্জের সময় সমবেত জনতার সামনে তাদের হাজির করতেন এবং লোকদের সামনে ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করতেন ঃ

ايها الناس انس لم ابعث عمالى عليكم اليصيبوا من ابشاركم ولا من اموالكم انما بعثتهم ليجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم فمن فعل به غير ذالك فليفم-

"হে জনতা! আমি আমার শাসকবর্গকে তোমাদের ওপর নিয়োগ করেছি এজন্যে নয় যে, তারা তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর হস্তক্ষেপ

www.icsbook.info

করবে। বরং তাদের নিয়োগ করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে, সরকারী ভাণ্ডার থেকে জাতীয় সম্পদ প্রয়োজনমত তোমাদের মাঝে বণ্টন করবে। এদের কেউ যদি এর বিপরীত কিছু করে থাকে, তাহলে এ জনসমাবেশে তার বিরুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ফরিয়াদ করো।"–তাবকাতে ইবনে সায়াদ, ৩য় খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

অমুসলিম ব্যক্তিস্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যেও পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত থাকে। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনবিদরা যে ফর্মূলা ঠিক করেছেন তাহলো ঃ

لهم مالنا وعليهم ما علينا ـ

"আমাদের জন্যে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যেও তাই এবং আমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব তাদের ওপরও তাই।"

হযরত আলী রা. বলেছেন ঃ

انما بذلوا الجزية لتكون اموالهم كاموا لنا ودماؤهم كدمائنا ـ

"অমুসলিম নাগরিকরা জিযিয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ মুসলিম নাগরিকদের মতোই সংরক্ষিত হবে।"
–আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা।

বস্তুত ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে বিরাট অধিকার ও সর্ববিদ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, দুনিয়ার অপর কোনো আদর্শিক রাষ্ট্রেও তার কোনো তুলনা নেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র বিরোধী মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় কি ? সেখানে সুযোগ-সুবিধা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা তো দূরের কথা, সমাজতন্ত্র বিরোধী কোনো আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক শুধু বেঁচেই থাকে না, বেঁচে থাকে সর্ববিধ অধিকারও লাভ করে। অমুসলিম নাগরিকদের জন্যে স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই নিরাপত্তার জিম্মাদার।

নবী করীম স. ঘোষণা করেছেন ঃ

من اذى ذميا فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة ـ

"যে লোক ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে কোনোরূপ কষ্ট দেবে, আমি নিজেই তার বিপক্ষে দাঁড়াবো এবং আমি যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো

www.icsbook.info

কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করবো।"
–আল জামেউস সাগীর লিস সুয়ূতী, ২য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা।

অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে নবী করীম স. যেসব অসীয়ত করেছেন, তার ভিত্তিতে ইসলামী আইন পারদর্শীগণ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব এবং তাদের কোনোরূপ কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। ফকীহ কারাফী বলেছেন ঃ অমুসলিম নাগরিককে যদি কেউ কষ্ট দেয়, একটি খারাপ কথাও বলে, তাদের অসাক্ষাতে তাদের ইজ্জতের ওপর একবিন্দু আক্রমণও কেউ করে কিংবা তাদের সাথে শত্রুতার ইন্ধন যোগায় তাহলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের এবং দীন ইসলামের দায়িত্বকে লংঘন করলো।

আল্লামা ইবনে হাজাম বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের ইজমা হয়ে গেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মিত অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করার জন্যে যদি কোনো বৈদেশিক শত্রু এগিয়ে আসে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো তার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে রক্ষা করা।"–আল ফরুক লিকিরাকী, ৩য় খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

আকীদা ও ইবাদাতের স্বাধীনতা

ইসলাম কোনো লোককে ইসলামী আকীদা গ্রহণের জন্য বলপূর্বক বাধ্য করে না। ইসলামে ধর্মমত গ্রহণে এবং পূজা-উপাসনা ও আরাধনা করার ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, একথা কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে এভাবে ঃ লা ইকরাহা ফীদ্‌দীন—'দীন গ্রহণ করানোর ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি করা চলবে না।' অন্য কথায় ইসলাম নিজে এ ব্যাপারে কোনোরূপ বলপ্রয়োগ করতে প্রস্তুত নয়, বলপ্রয়োগ করাকে সমর্থনও করে না। ইসলাম ধর্ম প্রচারে বলপ্রয়োগ নয়, শান্তি ও শৃঙ্খলা সহকারে প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মন ও চিন্তার পরিবর্তন সাধনে বিশ্বাসী। এজন্যে ইসলাম দাওয়াতী কাজের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ۔ النحل : ١٢٥

"তোমরা তোমাদের আল্লাহর দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দাও। যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা ও উত্তম ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে এবং বিরোধীদের সাথে উত্তম পন্থায় মুকাবিলা করো।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

www.icsbook.info

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তী করা সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ط قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ - البقرة : ٢٥٦

"দীন বা ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি করা যেতে পারে না। কেননা প্রকৃত হেদায়াতের পথ ও আদর্শ কোন্‌টি এবং কোন্‌টি পথভ্রষ্টতা তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬

এ পর্যায়ে শরীয়তের নির্দিষ্ট ফর্মূলা হলো ঃ

نتركهم وما يدينون

"তাদের এবং তারা যা কিছু পালন করে তা ছেড়ে দিলাম।"

অতএব অমুসলিমদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত-উপাসনার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কিছুই করণীয় নেই। নবী করীম স. নাজরানবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন, তাতে লিখেছিলেন ঃ

والنجران وحاشيتها جوار اللّه وزمة محمد النبى ﷺ رسول اللّه على اموالهم ملتهم وبيعتهم وكل ما تحتا ايديهم -

"নাজরানবাসীরা এবং তাদের সঙ্গী-সাথীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ স.-এর নিরাপত্তা লাভ করবে, তাদের ধন-সম্পদে তাদের গীর্জা ও উপাসনাগারে এবং আর যাকিছু তাদের রয়েছে সে ব্যাপারে।"

–কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, ৯১ পৃষ্ঠা।

এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হওয়া সত্ত্বেও খৃস্টান ও অন্যান্য বিধর্মীরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। তারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বা মুসলিম জনগণের পক্ষ থেকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কোনো অপকারিতাই তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পেরেছে।

বস্তুত ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে যতখানি আযাদী ভোগ করার সুযোগ রয়েছে, তত সুযোগ দুনিয়ার অন্য কোনো আইনে স্বীকৃত হয়নি। ইমাম শাফেয়ী র. বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি মুসলিম এবং অপরজন খৃস্টান হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত তাতে কোনো বাদ সাধবে না। কেননা তা যদি করা হয়, তাহলে ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। অথচ কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলো, অমুসলিমের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ বা জোর-জবরদস্তি করা হবে না।"–শারহুল কানজ, ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

www.icsbook.info

তবে এ পর্যায়ে মুরতাদকে শাস্তিদানের ইসলামী ব্যবস্থা নিয়ে কোনোরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। কেননা, সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। একজন মুসলিম নাগরিক যদি মুসলিম থাকার পর ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে মুরতাদ বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্র তাকে কঠোর শাস্তি দেবে। কেননা, সে যখন নিজেকে একবার মুসলিম বলে ঘোষণা দিয়েছে, তখন তাকে মুসলিম হয়েই ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করতে হবে। যদি সে তা না করে তাহলে সে ইসলামী রাষ্ট্রেরই ক্ষতি সাধন করে। আর দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রেই কোনো নাগরিকের রাষ্ট্রের এরূপ ক্ষতিকে বরদাশত করতে প্রস্তুত হতে পারে না বরং এটা অতীব যুক্তিসংগত কথা।

বাসস্থানের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি নাগরিকই তার বসবাসের স্থান গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তার অনুমতি ও সন্তোষ ছাড়া কেউই তার ঘরে প্রবেশ করার অধিকার পেতে পারে না। কেননা, বসবাসের স্থান হলো প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব গোপন এলাকা। এখানে তার সাথে তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ বাস করে। কাজেই এখানে যদি কেউ অপর কারোর ঘরে ও বসবাসের স্থানে বিনানুমতিতে প্রবেশ করে, তাহলে তা হবে তার অনধিকার চর্চা। আর ইসলামী রাষ্ট্রে কাউকেই কারোর ওপর অনধিকার চর্চার অধিকার দেয়া যেতে পারে না। কুরআন মজীদে এজন্যে স্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে ওজস্বিনী ভাষায় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ ـ النور : ٢٧-٢٨

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অপর লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না সে ঘরের লোকদের কাছ থেকে অনুমতি পাবে ও তাদের প্রতি সালাম করবে। তোমরা যদি বুঝতে পারো তবে এ নীতিই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। তোমরা সে ঘরে যদি কাউকে বর্তমান না পাও, তাহলে সেখানে তোমরা প্রবেশ করবে না—যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হবে। আর যদি তোমাদের ফিরে যেতে বলে তাহলে তোমরা ফিরেই যাবে। এই ফিরে যাওয়াই তোমাদের জন্যে পবিত্রতার নীতি। জেনে

www.icsbook.info

রাখবে, তোমরা যা কিছু করো, সে বিষয়ে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবহিত রয়েছেন।"–সূরা আন নূর ঃ ২৭-২৮

কর্মের স্বাধীনতা

শরীয়তসম্মত যে কোনো কাজই ইসলামে সম্মানার্হ। অতএব ব্যক্তিকে শরীয়তসম্মত যে কোনো কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ইসলামে। হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

ما اكل ابن ادم طعام خيرا من عمل يده وان نبى اللّه داؤد كان ياكل من عمل يده ـ

"ব্যক্তি তার নিজের শ্রমে উপার্জিত যে খাদ্য খায়, তার চেয়ে উত্তম খাওয়া আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহর নবী দাউদ আ.-ও নিজের শ্রমে অর্জিত খাদ্য খেতেন।"

অতএব ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যবসায়, শিল্পে ও কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন উপার্জন কাজে শুধু স্বাধীনতাই দেয়া হয় না, সে জন্যে রীতিমতো উৎসাহিতও করা হয়। তবে শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজের সুযোগ দেয়া হয় না ইসলামী রাষ্ট্রে। কেননা, সেরূপ কাজ করা হলে হয় তাতে অপরের প্রতি যুলুম হবে, না হয় তা নৈতিকতা বিরোধী কাজ হবে। আর এ ধরনের কাজে যে সমাজের সাধারণ মানুষেরই ক্ষতি সাধিত হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এভাবে ব্যক্তি যদি শরীয়তসম্মত কোনো কাজে ব্রতী হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবে এবং সে কাজের ফলাফল সে-ই ভোগ করবে। কেননা, প্রত্যেকেরই নিজের শ্রমের ফল ভোগ করার স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে। আল্লাহ কোনো আমলকারীর আমলের ফল বিনষ্ট করেন না—সে আমল বৈষয়িক উপার্জন সংক্রান্ত হোক কি পরকালীন, তা কুরআনেরই ঘোষণা।

তবে তার মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে, ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন নিরংকুশ স্বাধীনতাই দেয়া হয়েছে যে, কাউকে কোনো কাজের জন্যে কৈফিয়তও জিজ্ঞেস করা হবে না। যেমন সরকারী কর্মচারীরা যদি সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত থাকাবস্থায় উপার্জন সংক্রান্ত অন্য কোনো কাজ করে তবে সে অধিকার কাউকে দেয়া যেতে পারে না। এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক রা. তাঁর নিয়োগকৃত সরকারী কর্মচারীদের ধন-সম্পদের হিসাব নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এদের একজন যখন বললো ঃ

انى تاجرت فربحت ـ

www.icsbook.info

"আমি ব্যবসায় করেছি এবং তাতে মুনাফা পেয়েছি, এতে কার কি বলার থাকতে পারে ?"

জবাবে হযরত ওমর রা. বলেছিলেন ঃ

انا ما ارسلنا للتجارة-

"আমিতো তোমাকে ব্যবসায়ের জন্যে নিযুক্ত করিনি।"

–মাআলেমুশ শারহিল ইসলামী, আহমদ যারকা।

ব্যক্তি যে কাজ যতক্ষণ করতে চাইবে সে ততক্ষণই করবে এবং যখন সে কাজ ত্যাগ করার ইচ্ছা করবে, তখনই সে তা ত্যাগ করতেও পারবে। কিন্তু এ অধিকার এ শর্তের অধীন যে, তার এ কাজ ত্যাগ করায় অপর কারোরই যেন একবিন্দু ক্ষতি সাধিত না হয়। এজন্যে ইসলামী আইনবিদরা বলেছেন ঃ

يحوزلو لى الامر حمل ارباب الحرف والصناعات على العمل باجره المثل اذا امتنعوا عن العمل وكان فى الناس حاجة لصناعتهم وحرفهم-

"সর্বসাধারণের জন্যে জরুরী ও অপরিহার্য শিল্প ও ব্যবসায়ের কাজে তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বাধ্য করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে রাষ্ট্র সরকারের এবং সে জন্যে তাদের ন্যায্য মজুরী দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

–আত তুরুকুল হুকমীয়াতু ইবনে কাইয়েম।

এ কারণে এসব ক্ষেত্রের কর্মচারীদের সাধারণ ধর্মঘট করার কোনো অধিকারই ইসলামী রাষ্ট্রে দেয়া যেতে পারে না। কেননা, তার ফলে সাধারণ জন মানুষের জীবনে কঠিন বিপর্যয় নেমে আসার আশংকা রয়েছে। তবে তারা কাজ উপযোগী ন্যায্য মজুরীর দাবী জানাতে পারে ও সে জন্যে নিয়মতান্ত্রিক চাপ সৃষ্টিও করতে পারে। আর রাষ্ট্র তাদের কাজ অনুপাতে নায্য মজুরী নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য। কেননা সর্ব পর্যায়ে ইনসাফ কায়েম করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর শ্রমিকদের জন্যে ন্যায্য মজুরীর ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ইনসাফেরই অন্তরভুক্ত কাজ। এরূপ মজুরী দিতে মালিক পক্ষ যদি অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে রাষ্ট্র তাতে হস্তক্ষেপ করবে এবং মজুরী দানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে। তাহলে এর ফলে না শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না মালিক পক্ষ। বরং এর ফলে সামাজিক সাম্য ও শান্তি স্থাপিত হবে।

ব্যক্তিগত মালিকানা রাখার অধিকার

ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানা রাখার অধিকার দিয়েছে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর অন্যায়-

www.icsbook.info

ভাবে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। বরং তা রক্ষা করার দায়িত্বই পালন করতে হবে রাষ্ট্রকে। যদি কেউ তার ওপর হস্তক্ষেপ করে তবে তার প্রতিরোধের জন্যে সরকারকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে। অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং মালিক তার মালিকানা ভোগ ব্যবহার করার অবাধ অধিকারই লাভ করে থাকে। তবে তা শর্তহীন ও নিরংকুশ নয়। সে জন্যে কতগুলো জরুরী ও অপরিহার্য শর্ত পালন করতে হবে। এ শর্তগুলো মালিকানা লাভ, বৃদ্ধিসাধন ও তার ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরোপিত এবং যেসব দিক দিয়ে তা অন্য মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট সেব দিক দিয়ে তা অবশ্য লক্ষণীয়।

সাধারণ প্রচলিত কাজ ও শ্রমের পরিণামে অর্জিত সম্পদ, মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত ও পারস্পরিক লেনদেন ও চুক্তি ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত ধন ঐশ্বর্যে ব্যক্তিগত মালিকানা ইসলামী শরীয়তে বৈধ মালিকানারূপে স্বীকৃত। কিন্তু তাতে যদি চুরি, লুটতরাজ, জুয়া, মাত্রাতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ, ঘুষ ও সুদ ইত্যাদি ধরনের কোনো আয় জড়িত হয়, তবে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে কারোর মালিকানা বৈধ প্রমাণিত হলে তার ব্যয় ও ব্যবহারের অধিকারও নিসন্দেহে স্বীকৃত হবে এবং তা সে শরীয়তসম্মত পথে নিয়োগ করে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে। ধোঁকা-প্রতারণা, সুদী কারবার, মওজুদ করণ ও অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ ও সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করার অধিকার কারোর নেই। তা কেউ করলে তা সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে।

শরীয়তে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় প্রয়োজনে ও শরীয়তের কল্যাণ দৃষ্টিতে ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে ব্যক্তি মালিকানা হরণও করা যেতে পারে।

ব্যক্তি মালিকানার ওপর ইসলামী শরীয়ত অনেকগুলো শর্ত ও অধিকার ধার্য করেছে। যে লোকই ব্যক্তি মালিকানার অধিকারী তাকে এসব শর্ত পূরণ এবং অধিকার আদায় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ শর্তগুলোর মধ্যে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হলো (১) নিকটাত্মীয়দের অধিকার আদায়, (২) যাকাত দান ও (৩) অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা। অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রজনের সাহায্য দান করার কাজটি অপরিহার্য হবে তখন, যদি যাকাত ফাণ্ড ও সরকারী ব্যবস্থাপনা তাদের অভাব মেটাতে ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট না হয় এবং রাষ্ট্রের বায়তুলমাল এ কাজে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে।

www.icsbook.info

মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তির মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ অধিকার হরণ করার এবং এ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোর নেই। বস্তুত ব্যক্তির চিন্তা ও মানসিক প্রতিভার স্ফূরণের জন্যে ব্যক্তির মতের স্বাধীনতা থাকা একান্তই অপরিহার্য। এ না থাকলে মুসলমানরা তাদের দীনী দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালন করতে পারে না। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ তো মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। আর চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা থাকলেই এ কাজ বাস্তবায়িত হতে পারে। কুরআন মজীদে এ জিনিসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এ কাজকে মানুষের ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ـ العصر : ١ـ٣

"কালের শপথ, মানুষ মাত্রই ধ্বংসের মুখে উপস্থিত। তবে যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যাবলম্বনের জন্যে উপদেশ দেবে—তারা এ থেকে বাঁচতে পারবে।"–সূরা আল আছর ঃ ১-৩

বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ التوبة : ٧١

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রী পরস্পর বন্ধু। তারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ব্রতে ব্রতি হয়ে থাকে।"–সূরা আত তওবা ঃ ৭১

আর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ ـ ال عمران : ١٠٤

"তোমাদের মধ্য থেকে একটি সুসংহত বাহিনী এমন তৈরি হতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

হাদীসে নবী করীম স.-এর স্পষ্ট ঘোষণাও উদ্ধৃত হয়েছে এ পর্যায়ে ঃ

www.icsbook.info

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان-

"তোমাদের মাঝে যে লোক কোনো অন্যায় দেখতে পাবে, সে যেন তা তার শক্তি দিয়ে প্রতিহত করে, শক্তি না থাকলে মুখে যেন তার বিরুদ্ধে কথা বলে। আর মুখে বলার মতো অবস্থা না হলে অন্তত মনে মনেও যেন তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। যদিও এ অত্যন্ত দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"

শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর তীব্র-তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং তাদের কোনো ত্রুটি গোচরীভূত হলে তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা প্রত্যেকটি নাগরিকেরই কর্তব্য। আর এসব কাজ সম্ভব হতে পারে ঠিক তখন যদি ব্যক্তির মত পোষণ ও প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত থাকে।

পারস্পরিক পরামর্শ বিধান এ কাজে যে মতবিরোধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতেও চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা অপরিহার্য, বরং তা না থাকলে পারস্পরিক পরামর্শের ইসলামী বিধান কার্যকরই হতে পারে না।

এসব কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তিদের নিজস্ব চিন্তা ও মতের স্বাধীনতাকে পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা হয়। ব্যক্তিদের অনুরূপ পরিবেশ দিয়ে লালন ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং শাসন-কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে জনগণকে সবসময়ই উৎসাহ দান করে থাকে। কেউ যদি এ অধিকার ভোগ না করে তাহলে বরং তাদের কড়া শাসন করা হয়। এ পর্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো শেষ নেই। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে লক্ষ করে এক ব্যক্তি বললো ঃ 'হে ওমর! তুমি আল্লাহকে ভয় কর।' তখন হযরত ওমর রা. বললেন, "হ্যাঁ, আমাকে তাই বলবে। না বললে বরং তোমরা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর আমরাও কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবো না, যদি তা না শুনি।"

তবে ব্যক্তির স্বাধীন মত পোষণ ও প্রকাশের শুধু সুযোগ থাকাই যথেষ্ট নয় বরং সে জন্যে তাদের মাঝে প্রবল মনোবল, সৎ সাহস ও বীরত্ব বর্তমান থাকা আবশ্যক। শাসকদের ব্যাপারে তাদের সম্পূর্ণ নির্ভীক হতে হবে, তবেই তারা এ সুযোগের পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করতে পারবে। কেননা ভয়, ত্রাস ও শংকা মানুষকে তার স্বাধীন মত প্রকাশ থেকে বিরত রাখে, সুযোগ হলেও কোনো কথাই তাকে বলতে দেয় না। আর কোনো জাতি যদি এমনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। সে জাতি আল্লাহর রহমত থেকেও হয় বঞ্চিত। এজন্যে নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন ঃ

www.icsbook.info

اذا رايت امتى تهاب ان تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها ـ

"তুমি যখন আমার উম্মতকে দেখবে যে, সে যালেমকেও যালেম বলতে ভয় পায়, তখন তুমি তার কাছ থেকে বিদায় নিবে।"

আর মুসলমানদের মনোবল, সাহস, হিম্মত ও বীরত্বের মূল উৎস হচ্ছে তাদের তওহিদী আকীদা। এ আকীদা যদি তাদের মনে বদ্ধমূল হয় এবং তারা গভীরভাবে এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে, তাহলে তাদের মনে জাগবে এ সাহস ও বীরত্ব। মুসলমানদের একথাই বুঝতে হবে যে, ক্ষতি-উপকার সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, অন্য সবই আল্লাহর দাসানুদাস মাত্র, রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সকলে আল্লাহরই সৃষ্ট, আল্লাহর কাছে তাদেরও হিসাব দিতে হবে। তাহলেই তারা সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের মত প্রকাশ করার সাহস পাবে এবং এ ব্যাপারে তারা কাউকেই ভয় পাবে না।

ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমা

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তির মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা নিরংকুশ ও উচ্ছৃংখল হতে পারে না। বরং সে জন্যে কিছু শর্ত এবং কিছু কিছু নিয়ম-নীতি অবশ্যই রয়েছে। তার আসল শর্ত হলো, তার মূলে সদিচ্ছা নিহিত থাকতে হবে, কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই হতে হবে তার চরম লক্ষ্য। মত প্রকাশের এ স্বাধীনতা থেকে সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করাই উদ্দেশ্য হতে হবে। আর এ শর্ত ইসলাম প্রদত্ত অপরাপর অধিকার ভোগের মতোই অত্যন্ত যুক্তিসংগত। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে নিজের বীরত্ব ও বাহাদুরী জাহির করা চলবে না, চলবে না তা করে অন্যকে হীন প্রমাণ করার চেষ্টা করা। কিংবা অপর কোনো বৈষয়িক স্বার্থ লাভ করার চেষ্টা করা।

তৃতীয় শর্ত এই যে, এ অধিকার ভোগ করার সময় ইসলামের মৌলিক আকীদা ও ইসলামের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বৈধতার বিরোধিতা করা চলবে না। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের সমালোচনা করা চলবে না এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ইসলামী আদর্শের কোনো দোষ প্রচার করার অধিকারও কাউকে দেয়া যেতে পারে না। কেননা, এ কাজ মুসলিমকে মুরতাদ বানিয়ে দেয়, সে জন্যে তার শাস্তি হওয়াই বিধেয়। আর চতুর্থ শর্ত এই যে, ইসলামের নৈতিক নিয়ম-নীতিকে পূর্ণ মাত্রায় বহাল রাখতে হবে তাকে লংঘন করা চলবে না। কেউ কাউকে গালাগাল করতে পারবে না, মিথ্যা দোষারোপ করতে পারবে না কেউ কারো ওপর। কেননা, সেরূপ করার স্বাধীনতা দেয়ার মানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়।

www.icsbook.info

এ পর্যায়ে একথাও মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র, সরকার ও সরকারী দায়িত্বশীল কর্মচারীদের কাজকর্ম ও চরিত্রে কোনোরূপ অন্যায় দেখতে পেলে তার বিরুদ্ধে কথা বলারও পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে প্রত্যেকটি নাগরিকের। কিন্তু তাই বলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কথা বলার অধিকার কাউকে দেয়া যেতে পারে না। বিপরীত মতাদর্শের সাথে মতবিরোধ করার অধিকার রয়েছে, তার সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনাও করা যেতে পারে ; কিন্তু কারোর সভা-সম্মেলনে গোলযোগ করার অধিকার কারোর থাকতে পারে না। আর যতক্ষণ কেউ বিপরীত মত পোষণ করা সত্ত্বেও কোনোরূপ অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি না করবে, ততক্ষণ সরকারও তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। ব্যক্তিগত মত পোষণ ও প্রকাশের ব্যাপারে এই হলো সীমা নির্দেশ। এ সীমা রক্ষা করাই সকল শ্রেণীর নাগরিকদের কর্তব্য। এ পর্যায়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হলো, হযরত আলী রা.-এর খেলাফত আমলে বিরোধী মতাবলম্বী খাওয়ারিজদের প্রতি তাঁর গৃহীত নীতি। তাদের লক্ষ্য করে খলীফা বলেছিলেন ঃ

ولا نبدؤكم بقتال مالم تحدثوا فسادا ـ

"তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনোরূপ অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই শুরু করবো না।"

–নাইলুল আওতার, ৭ম খণ্ড, ১৫৭ পৃ.।

বস্তুত বিরোধী মতাবলম্বীরা যতক্ষণ জনগণকে তাদের মত গ্রহণে বলপূর্বক বাধ্য করতে না চাইবে, ততক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর দমন নীতি গ্রহণ করবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত বরং সরকারের কর্তব্য হলো তাদের বুঝানো, ভালো শিক্ষাদান ও উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে তাদের মনের পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা। খাওয়ারিজদের সম্পর্কে এ নীতিই গৃহীত হয়েছিল। বলা হয়েছে, তারা ইনসাফ পূর্ণ সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও যদি তাদের মতাদর্শ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো তাদের মতাদর্শের দোষ-ত্রুটি ও মারাত্মকতা লোকদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা। তাহলে তারা সে ভুল মত ত্যাগ করে সত্য ও নির্ভুল মতাদর্শ গ্রহণ করে সমাজের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

–ইমতাউল আসমা, ১০১ পৃষ্ঠা।

শিক্ষালাভের অধিকার

ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার এবং জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। ইসলাম মানুষকে জ্ঞানলাভের জন্যে তৎপর হতে, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করতে ও সে জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

www.icsbook.info

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا -

"তুমি বলো, হে রব! আমার জ্ঞান ও বিদ্যা বাড়িয়ে দাও।"

আর আমল কবুল হওয়ার জন্যে ইলম তো একান্তই জরুরী। কেননা সে আমল কেবল আল্লাহর কাছে কবুল হতে পারে, যা হবে খালেসভাবে কেবল মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, যা হবে শরীয়তের বিধান মোতাবিক নির্ভুল ও সঠিক। আর ইলম-জ্ঞান ও বিদ্যা ছাড়া এরূপ হওয়া সম্ভব নয়।

ইলমও কয়েক প্রকারের রয়েছে। কিছু ইলম তো অর্জন করা 'ফরজে আইন'। যেমন আকীদা ও ইবাদাত সংক্রান্ত ইলম। আর কতকগুলো রয়েছে 'ফরযে কেফায়া'। এ জ্ঞান সাধারণভাবে সমাজ ও জাতির লোকদের কারো মধ্যে থাকলেই হলো। মানুষের দীনের বিস্তারিত রূপ, শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যে, রাষ্ট্র শাসন বিধি, আইন-কানুন ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান এ পর্যায়ে গণ্য। এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনও জরুরী বটে ; এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে জনগণের মধ্যে এসব জ্ঞান বিস্তারের জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নবী করীম স.-এর কর্মপদ্ধতি থেকে এ পর্যায়ে সরকারী দায়িত্বের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বদর যুদ্ধে যেসব কুরাইশ বন্দী হয়েছিল তাদের মুক্তিপণ হিসাবে ঠিক করে দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেক লেখাপড়া জানা বন্দী অন্তত দশজন মুসলমানকে লেখাপড়া শেখাবে। কেননা তখন মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। রসূলে করীম স. রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনবোধ করেছিলেন।

ভরণ-পোষণের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা লাভের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই খাদ্য-পানীয়-বস্ত্র-বাসস্থানের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। কোনো নাগরিকই এসব মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। যে লোক নিজের সামর্থে স্বীয় প্রয়োজন পূরণে সমর্থ হবে না, সমাজ ও রাষ্ট্র তার সে প্রয়োজন পূরণের জন্য দায়ী। এসব মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে কেউই বাধ্য হয় না ইসলামী রাষ্ট্রে।

ইসলামী রাষ্ট্রের এরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো এই যে, ইসলামী সমাজই হলো পারস্পরিক সাহায্য-ভিত্তিক সমাজ। এ সমাজের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত। কেননা মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

www.icsbook.info

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

"তোমরা সবাই পরস্পরের সাহায্য কাজে এগিয়ে যাও। নেক কাজ ও তাকওয়া সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এবং গুনাহের কাজ ও আল্লাহদ্রোহিতায় কোনোরূপ সাহায্য করো না কারোর।"

আর অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব মোচনের চেয়ে বড় নেক কাজ কি হতে পারে ! পারস্পরিক সাহায্য সংক্রান্ত কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, সচ্ছল অবস্থার লোকেরা অভাবগ্রস্ত ও গরীব লোকদের সাহায্য করবে। তাতে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হবে। নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন ঃ

من كان له فضل من زاد فليعد به على من لازاد له -

"যার খাবার বেশী আছে সে তাকে তা দেবে, যার খাবার নেই। আর যার পাথেয় বেশী আছে সে তা সেই পথিককে দেবে যার পথের সম্বল নেই।"–আন মাহাল, ইবনে হাযম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৬ পৃ.।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من كان عنده طعام اثنين فليذهب مثالث ومن كان عنده طعام اربعة فليذهب بخامس او سادس

"যার কাছে দু'জনার খাবার আছে, সে যেন তিনজনকে খাওয়ায়। আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে, সে যেন পাঁচজন কিংবা ছয়জনকে খাওয়ায়।"–আন মাহাল, ২য় খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।

বস্তুত রাষ্ট্র হলো সমাজ সমষ্টিরই প্রতিভূ, সমাজের লোকদের প্রতিনিধি। কাজেই এ হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য অনুযায়ী আমল করা সমাজ-সমষ্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্র-সরকারেরই দায়িত্ব। অতএব একথা প্রমাণিত যে, ইসলামী রাষ্ট্র দেশের সমস্ত অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র জনের অভাব মেটানোর জন্যে দায়িত্বশীল। এ পর্যায়ে আরো একটি হাদীস উল্লেখ্য। তাতে সরকারের এ দায়িত্বের কথাই প্রমাণিত হয়। বলা হয়েছে ঃ

فاى مؤمن مات وترك ما لافترثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا او ضياعا فليأتنى فانا مولاه -

"যে মু'মিন মরে যাবে ও ধন-সম্পদ রেখে যাবে, তার নিকটাত্মীয়রাই তার ওয়ারিস হবে। আর যে মু'মিন ঋণ রেখে বা অক্ষম সন্তান রেখে যাবে, তাদের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আমিই তাদের অভিভাবক হবো।"

www.icsbook.info

নবী করীম স. এ দায়িত্ব পালন করতেন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে, রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে, নিজের সম্পত্তি থেকে নয়। কাজেই এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامير الذى علي الناس راع وهو مسئول عنهم -

"তোমাদের প্রত্যেকেই অপরের জন্যে দায়ী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব জনগণের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের জন্যে দায়ী, তাকে জনগণের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।"

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী লিখেছেন ঃ "এ হাদীসে 'দায়িত্বশীল' বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার অধীন যাবতীয় বিষয়ে দেখাশুনা করা, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা এবং দীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে তাদের পক্ষে কল্যাণকর যাবতীয় বিষয়ে ইনসাফ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।" আর জনগণের বৈষয়িক কল্যাণ হচ্ছে তাদের যাবতীয় বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণ করে দেয়া, যদি তারা নিজেরা তা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ প্রয়োজন পূরণ হলেই তাদের আল্লাহর বন্দেগী সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনও সহজ হতে পারে। কেননা, একথা সর্বজনবিদিত যে, যারা তাদের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হয়, তারা সে চিন্তায় এমন কাতর হয়ে পড়ে যে, তারা আল্লাহর বন্দেগীর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না।

ব্যক্তির অধিকার আদায়ে শরীয়তের বিধান

ব্যক্তির অধিকার আদায় করার জন্যে ইসলামী শরীয়তে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্র এ ব্যাপারে জনগণকে সাধারণ নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে। এ জন্যে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা কয়েক পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

প্রথম ঃ ব্যক্তির শ্রম ও কাজ। এ পর্যায়ে মৌলিক কথা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই নিজের প্রয়োজন নিজে পূরণ করবে। সে কাজ করবে, উপার্জন করবে। সে জন্যে অপর কোনো মানুষের সামনেই ভিক্ষার হাত দরাজ করবে না। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে "ওপরের হাত নিচের হাতের তুলনায় অনেক উত্তম।" অতএব গ্রহণের চেয়ে দান ভালো। আর দান সম্ভব হয় যদি ধন থাকে এবং ধন শ্রম ও উপার্জন ব্যতিরেকে হস্তগত হওয়া সম্ভবপর নয়। হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

www.icsbook.info

والذى نفسى بيده لان ياخذ احدكم حبله فيذهب به الى الجبل فيخطب ثم ياتى فيحمله على ظهره فياكل خيره له من ان يسال الناس-

"যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তাঁর নামে কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় এবং কাষ্ঠ আহরণ করে পিঠের ওপর রেখে বহন করে নিয়ে আসে, তা বিক্রি করে অর্থ রোজগার করে এবং তা দিয়ে নিজের ভরণ-পোষণ চালায়, তবে তা লোকদের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভালো।"

সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

দ্বিতীয় ঃ বস্তুত মানুষ নিজে যদি কাজ করতে ও তার মাধ্যমে স্বীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে যেমন ভিক্ষা করবে না, তেমনি কোনোরূপ সরকারী সাহায্যেরও মুখাপেক্ষী হবে না। আর কাজ করাই যখন শরীয়তের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় এবং ভিক্ষা করা যখন ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য ; আর ইসলামী রাষ্ট্রের যখন দায়িত্বই হলো যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো তাকে বাস্তবায়িত করা এবং যা শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ তাকে নির্মূল করা তখন ইসলামী রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব সুস্পষ্ট যে, যখন ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য ; আর ইসলামী রাষ্ট্রের যখন দায়িত্বই হলো যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো তাকে বাস্তবায়িত করা এবং যা শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ তাকে নির্মূল করা তখন ইসলামী রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব সুস্পষ্ট যে, নাগরিকদের জন্য কাজ করে উপার্জন করার পথ সুগম ও সহজ করে দেবে। অতএব নানা কাজের উদ্ভাবন করে বেকার লোকদের জন্যে কাজের ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেই সাথে বায়তুলমালের ধন-সম্পদ বিলাসিতায় বা বিনা প্রয়োজনে ব্যয় করা কিংবা অকল্যাণকর কাজে অর্থ বিনিয়োগ করা বন্ধ করতে হবে। নাগরিকদের কোনো না কোনো রোজগার বিনিয়োগের জন্যে বায়তুলমাল থেকে ব্যক্তিগত ঋণ দানের প্রয়োজন হলে তাও দিতে হবে। কেননা ভিক্ষা দানের অপেক্ষা ঋণ দান খুবই শ্রেয়। ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেছেন ঃ

ان صاحب الارض الخراجية اذا عجز عن زراعة ارضه لفقره دفع اليه كفايته من بيت المال قرضا ليعمل وليستغل ارضه-

"খারাজী জমির মালিক যদি দারিদ্রতা বশত জমি চাষ করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে বায়তুলমাল থেকে ঋণ দিতে হবে, যেন সে শ্রম করে জমিতে ফসল ফলাতে পারে।"-ইবনে আবেদীন, ৩য় খণ্ড, ৩৬৪ পৃ.।

www.icsbook.info

সাহায্য লাভের অধিকার

ব্যক্তি যদি কোনো কাজ না পায় এবং রুজী-রোজগারের নিজস্ব কোনো উপায় না থাকে, তাহলে তার নিকটবর্তী ধনী ও সচ্ছল আত্মীয় তাকে সাহায্য করবে। তা করা তার ওপর ওয়াজিব। দরিদ্র ব্যক্তি এভাবে নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। এও এক সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার মধ্যে পরিবারস্থ ও নিকটাত্মীয় লোকেরা শামিল রয়েছে। এরূপ ব্যবস্থা কার্যকর করা ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তির কেবল অনুগ্রহের ওপরই নির্ভরশীল নয়, বরং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ করা তার একান্তই কর্তব্য।

যাকাত

সমাজে যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হবে যে, তার নিজের কোনো কামাই রোজগারের ব্যবস্থা নেই এবং তার নিকট আত্মীয়দের মধ্যেও এমন কেউ নেই, যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে যাকাত ফাণ্ড থেকে। কেননা, ধনীদের কাছ থেকে যে যাকাত আদায় হওয়া ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ব্যবস্থা, তা এ শ্রেণীর গরীব লোকদেরই প্রাপ্য। আসলে শরীয়তের বিধান হলো, রাষ্ট্র-সরকার এ যাকাত আদায় করবে এবং তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে সরকারীভাবেই বণ্টন করবে। যাকাতের টাকা এ শ্রেণীর গরীবদের ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করা জায়েয নয়। এজন্যে আদায় ও বণ্টনের কার্যকর ব্যবস্থা ও বিভাগ কায়েম করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

বস্তুত যাকাত হচ্ছে গরীব লোকদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি। যাকাত আদায় করার জন্যে সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা করতেও কুণ্ঠিত হওয়া চলবে না। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। বস্তুত যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হলে সমাজের কোনো গরীবই তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। কেননা, যাকাত গ্রহণ করা হয় মূলধন, তারা মুনাফা, পণ্য দ্রব্য, জমির ফসল (ওশর), ব্যবসায়ের পশু ও খনিজ দ্রব্য থেকে। বাংলাদেশে যদি রীতিমত হিসাব করে যাকাত আদায় করা হয় তাহলে তার পরিমাণ বছরে প্রায় একশ' কোটিতে এসে দাঁড়াবে।

বায়তুলমাল থেকে সাহায্য দান

পূর্বোক্ত ব্যবস্থাসমূহেও যদি জনগণের অভাব মেটানোর জন্যে যথেষ্ট না হয়, তাহলে রাষ্ট্র সরাসরি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং সব অভাবগ্রস্ত

www.icsbook.info

ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন করবে। ব্যক্তির প্রতি সমাজ-সমষ্টির যে দায়িত্ব, তা এভাবেই পালিত হতে পারে। অতএব বায়তুলমাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের ওপর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ

والمحتاجون اذا لم تكفهم الزكاة اعطوا من بيت المال على وجه التقديم على غيرهم من وجوه الصرف على راى -

"যাকাত দ্বারা যদি অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষ থেকে তাদের জন্য অন্যান্য কাজ বাদ দিয়েও অর্থ ব্যয় করতে হবে।"–আস সিয়াসাতুশ শারইয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ৫৩ পৃষ্ঠা।

এমনকি, রাষ্ট্র সরকার যদি এ দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে অভাবগ্রস্তরা সরকারের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে এজন্যে মামলাও দায়ের করতে পারে। তখন বিচারপতি সরকারকে এ কাজ করতে বাধ্য করবে। ইসলামী আইন বিশারদ ইবনে আবেদীন একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

ان القاضى يلزم ولى الامر الزاما قضائيا بالانفاق على الفقير العاجز كما يلزم وليه او قريبه الغنى اذا كان له قريب غنى -

"বিচারপতি যেমন অক্ষম-দরিদ্র ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের জন্যে তার ধনী অভিভাবক বা নিকটাত্মীয়কে বাধ্য করবে, তেমনি রাষ্ট্রপ্রধানকেও বিচারের মাধ্যমে এজন্যে বাধ্য করবে।"–আত তাশরীউল ইসলামী, শায়েখ মুহাম্মদ, আবু জোহরা।

দরিদ্র জনগণের অভাব মেটানোর ব্যাপারে সরকারের দায়িত্বের কথা ইসলামের ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত হয়। হযরত ওমর ফারুক রা. এ দায়িত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষকালে তিনি অভাবগ্রস্তদের জন্যে সরকারী পর্যায়ে খাবার তৈরি করিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিয়েছিলেন এ বলে ঃ "যার ইচ্ছা এ খাবার খেয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে পারে, আর যার ইচ্ছা বায়তুলমাল থেকে তার ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজন পরিমাণ সামান-সামগ্রী গ্রহণ করতে পারে।"

রাষ্ট্র এ সাহায্যদানে অক্ষম হলে

অভাবগ্রস্ত লোকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্র যদি কখনো অক্ষম হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রীয় কোষ যদি শূণ্য হয়ে যায়, কিংবা বায়তুলমালে

www.icsbook.info

এমন পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, যা সমস্ত অভাবগ্রস্ত লোকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে যথেষ্ট নয়, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সমাজের ধনশালী ব্যক্তিদের ওপর অর্পিত হবে এবং 'ফরযে কেফায়া' হিসাবে তা সমগ্র জাতির পক্ষ থেকেই তাদের পালন করতে হবে। ইসলামী ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

ومن فروض الكفاية دفع ضرب المسلمين لكسرة عار واطعام جائع اذا ليرفع بزكاة وبيت مال على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية لسنة لهم والمونهم -

"যাকাত ও বায়তুলমালের সাধারণ অর্থ-সম্পদ যদি অসমর্থ হয়, তাহলে বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ও অভুক্তকে অন্নদান প্রভৃতি জরুরী কাজে আনজাম দেয়ার দায়িত্ব পড়বে তাদের মধ্যে সচ্ছল ও সমর্থ লোকদের ওপর। এ দায়িত্ব তাদের জন্যে ফরযে কেফায়া হিসাবে অতিরিক্তভাবে চাপবে।"

–আল মিনহাজ, ইমাম নবভী এবং তার শরাহ ঃ ৭ম খণ্ড, ১৯৪ পৃ.।

একথার অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী বস্ত্র দিতে হবে, চিকিৎসার প্রয়োজন পূরণও এরই অন্তরভুক্ত বলে চিকিৎসকের মজুরী ও ঔষধের মূল্য দেয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। আর অক্ষম ও পংগু লোকদের জন্যে খাদেম নিয়োগও এ পর্যায়েরই একটি জরুরী কাজ। অতএব বায়তুলমাল যতক্ষণ অক্ষম থাকবে সমাজের ধনী লোকেরাই অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণে বাধ্য থাকবে। আর ধনী লোকেরা তা করতে যদি অস্বীকার করে, তাহলে সরকার তা করার জন্যে তাদেরকে আইনত বাধ্য করবে। ইমাম ইবনে হাজম এ পর্যায়ে লিখেছেন ঃ

وفرض على الاغنياء من اهل كل بلد ان يقوم بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذالك ان لم تقم الزكاة بهم ولا فى سائر اموال المسلمين بهم فيقام لهم بما ياكلون من القوت الذى لابد ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذالك والمسكين يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة -

"যাকাত ফাণ্ড রাষ্ট্রীয় কোষাগার দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হলে তখন তাদের পেটভরা খাবার ও শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী পোশাক এবং বর্ষা, শীতের, রৌদ্রতাপ ও পথচারীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।"–আল মুহাল্লা, ইবনে হাজম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

www.icsbook.info

অমুসলিম নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার যে মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা কেবল মুসলিম নাগরিকদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। অমুসলিম নাগরিকদের জন্যেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বস্তুত এ ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিমে কোনোই পার্থক্য করা হয় না। এ পর্যায়ে প্রমাণ হিসাবে সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে অলীদ রা.-এর স্বাক্ষরিত এক চুক্তিনামার একটি অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته افة من الافات او كان غنيا فافتقر وصار اهل دينه يتصدقون عليهم طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين ما اقام بدار الهجرة دار الاسلام

"অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যে লোক বার্ধক্য, পংগুতা বা বিপদের কারণে অথবা সচ্ছলতা থাকার পর দরিদ্র হয়ে পড়ার কারণে যদি এমন অবস্থায় পড়ে যায় যে, তার স্বধর্মীরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করেছে, তাহলে তার পক্ষ থেকে জিযিয়া নেয়া বন্ধ করা হবে এবং সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন পর্যন্ত তার পরিবারবর্গকে বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণ করা হবে।"–কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, ১৪৪ পৃ.।

হযরত খালেদ রা. সেনাপতি হিসাবে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তখনকার খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। অতএব এ নীতি সম্পর্কে সকল সাহাবীর ইজমা সম্পাদিত হয়েছে বলা চলে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ র. তাঁর বসরার শাসনকর্তা আদী ইবনে আরতাতকে লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ

انظر من قبلك من اهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته ولت عنه المكاسب فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ـ

"তুমি নিজে লক্ষ্য করে দেখ, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক বয়োবৃদ্ধ ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং যার উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজন মত অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে তাদের দাও।"–কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ, ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা।

নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার

রাষ্ট্রের ওপর নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু রাষ্ট্র নাগরিকদের এসব অধিকার যথাযথরূপে

www.icsbook.info

আদায় করতে পারে না, যদি নাগরিকগণ এ কাজে রাষ্ট্রের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা না করে। আসলে রাষ্ট্র বাইরে থেকে আসা কোনো জিনিস নয়, জনগণ গঠিত সংস্থারই অপর নাম রাষ্ট্র ও সরকার। এজন্যে জন-প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্যে যে সংস্থা গঠন করা হয়, সার্বিক ও নির্বিশেষভাবে সকলকেই বাস্তব সহযোগিতা করতে হবে। জনগণের শক্তিই রাষ্ট্রের শক্তি। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব জনগণের বাস্তব সহযোগিতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। অতএব বলতে হবে, রাষ্ট্রেরও অনেক অধিকার রয়েছে জনগণের ওপর এবং সে অধিকারসমূহ জনগণকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

রাষ্ট্র হলো জনগণের ঘর, জনগণ এ ঘরেই বসবাস করে, জীবন যাপন করে। জনগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় নিশ্চিন্তে দিন যাপন করে। জনগণের খেদমত-জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই রাষ্ট্রের কাজ। এক কথায় রাষ্ট্র জনগণের খাদেম। রাষ্ট্র যেন বংশের পিতা-পৈত্রিক স্নেহ-মমতা নিয়েই জনগণের খেদমত করতে হবে—যেমন পিতা স্নেহ-মমতাভাজন হয়ে থাকে ছেলে-সন্তান ও পরিবারবর্গের প্রতি। তাই জনগণের কল্যাণ হলো জনগণের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার। এ অধিকার আদায়ে রাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতা করাই জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাস্তব সহযোগিতা নিয়েই এগিয়ে আসতে হবে দেশের জনগণকে। জনগণ যদি রাষ্ট্রের এ অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ও যথাযথভাবে আদায় না করে, তাহলে তার পরিণাম এই হবে যে, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ থেকে যাবে এবং তার সমূহ ক্ষতি জনগণকেই ভোগ করতে হবে। তার পরিণতিতে জন-জীবনে নেমে আসবে কঠিন বিপর্যয়ের ঢল। এ কারণে জনগণের ওপর রাষ্ট্রের প্রধানতম অধিকার হলো, জনগণ রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করবে, রাষ্ট্রের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলবে। রাষ্ট্রের মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে কোনো কাজের জন্যে সতত প্রস্তুত থাকবে। জনগণের উপর রাষ্ট্রের এ অধিকার দু'টি সম্পর্কেই আমরা সর্বপ্রথমে আলোচনা করবো।

প্রথম ঃ আনুগত্য পাওয়ার অধিকার

এ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج -

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য স্বীকার করো আল্লাহর, অনুগত হয়ে চলো রসূলের এবং তোমাদের মাঝে দায়িত্বশীলদেরও।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯

www.icsbook.info

আয়াতে উল্লিখিত 'উলুল আমর' অর্থ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা অথবা ইসলামী আইন-বিধানে পারদর্শী ব্যক্তিরা।–আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ২য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ৫১৮ পৃ. তাফসীরে কুরতুবী, ৫ম খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন ঃ

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره مالم يؤمن بمعصية-

"মুসলিম নাগরিককে রাষ্ট্রের আনুগত্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তার আদেশ-নিষেধ অবশ্যই মেনে চলতে হবে সব ব্যাপারেই, তা তারা পসন্দ করুক আর না-ই করুক—যতক্ষণ না তাদের কোনো গোনাহ ও নাফরমানীর আদেশ করা হয়।"

–শারহে সহীহ বুখারী, আল আসকালানী, ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

অতএব জনগণের রাষ্ট্রানুগত্য প্রতিফলিত হবে প্রশাসকদের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে। জনগণের ওপর রাষ্ট্রের এ অধিকার শরীয়তসম্মত এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ জনকল্যাণ বিধানে কায়েম করা সংগঠন-প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা জনগণের কর্তব্য। জনগণের রাষ্ট্রানুগত্য স্বেচ্ছামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ জিনিস জনগণের অন্তর থেকে ফুটে ওঠা উচিত। এজন্যে যেন রাষ্ট্রকে জোর-জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগ করতে না হয়, তা-ই শরীয়তের কাম্য। রাষ্ট্রীয় অনানুগত্যের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে মহা অশান্তি ও দুঃখ নেমে আসে। আনুগত্যহীন এ লোকদেরকে দমন ও বশ করার জন্যে রাষ্ট্রকে অকারণে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় ; বিদ্রোহীদের মূলোৎপাটনে রাষ্ট্রকে শক্তি ব্যয় করতে হয়। আর এ কাজে যে শক্তি ক্ষয় হয়, তা জনগণের কোনো ইতিবাচক কল্যাণ সাধন করতে পারে না। এছাড়াও অনানুগত্য ও বিদ্রোহের ভাবধারা জনগণের একাংশে দেখা দিলে তা গোটা জনসমাজে বিষ বাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সমাজে দেখা দেয় উচ্ছৃঙ্খলতা, অশান্তি ও বিপর্যয়। রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হয়। রাষ্ট্র যদি জনগণের ওপর এজন্যে বলপ্রয়োগ করে তাহলে জনগণের মনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ভাবধারা জেগে ওঠে। আর রাষ্ট্রও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্ণ শক্তিতে জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে যে রাষ্ট্র জনকল্যাণে নিযুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে গঠিত তা-ই গণবিরোধী ও দুর্ধর্ষ অত্যাচারী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে বসে। এর ফলে রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়, নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে যায় যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা। আর শেষ পর্যন্ত তা ধ্বংস হতেও বাধ্য হয়।

www.icsbook.info

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, জনগণকে সব ব্যাপারেই রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে হবে—জনগণ পসন্দ করুক আর না-ই করুক। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ্য। রসূলে করীম স. ইরশাদ করেছেন ঃ

"মুসলিম নাগরিকদের কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের আনুগত্য করা—শুনা ও মেনে চলা। সর্ব ব্যাপারে—তা তাদের পসন্দ হোক আর না-ই হোক।"

রাষ্ট্র দেশের সব মানুষকে একই সময় খুশী করতে পারে না। সকলের মত ও সমর্থন নিয়ে কাজ করাও রাষ্ট্রের পক্ষে সবসময় সম্ভবপর হয় না। আইন ও শাসনকার্য সকল ব্যক্তির মর্জীর ওপর নির্ভরশীল হলে কোনো রাষ্ট্র কাজ করতে পারে না। রাষ্ট্রের সব কাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সন্তুষ্ট হবে এমন কথা বলা যায় না। বরং দেখা যায়, একটি কাজে কিছু লোক সন্তুষ্ট হলেও অপর কিছু লোক তাতে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই সবাইকে খুশী ও রাজী করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। সঠিকভাবে সমস্ত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রকে কাজ করতে হবে, আইন ও প্রশাসন চালাতে হবে। অতএব রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে খামখেয়ালীর মানদণ্ডে বিচার করা উচিত হবে না কখনো। আর মনমতো কাজ করাও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের পূর্ব শর্ত হওয়া উচিত হতে পারে না ? জনগণ ইচ্ছা হলে রাষ্ট্রের আনুগত্য করবে, না হলে করবে না। এরূপ মনোভাব কোনো রাষ্ট্রেই চলতে পারে না। জনগণের ইচ্ছামূলক আনুগত্য রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনের অনুকূল নয়, বরং তা তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বস্তুত রাষ্ট্রের অধীন সব মানুষকেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। অনুগত হয়ে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে কাউকে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেয়া যেতে পারে না।

অতএব রাষ্ট্রের আনুগত্য আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারেই হতে হবে। তাকে মনে করতে হবে, যে রাষ্ট্রের আনুগত্য করে সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল স.-এরই আনুগত্য করেছে। কেননা আল্লাহ-ই নাগরিকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য তা আল্লাহ ও রসূল স.-এর আনুগত্যের ওপর ভিত্তিশীল, রাষ্ট্রকে এজন্যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তাহলে জনগণ যেমন নামাযে ইমামের আনুগত্য করে থাকে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তেমনি তারা মেনে চলবে রাষ্ট্র পরিচালক তথা প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে।

মনে রাখতে হবে, ইসলামে এ রাষ্ট্রানুগত্য শর্তহীন নয়। হাদীসে সে জন্যে একটি মাত্র শর্তেরই উল্লেখ করা হয়েছে। সে শর্ত হলো, রাষ্ট্র এমন কাজ করার আদেশ দিতে পারবে না যা পালন করলে আল্লাহ ও তার রসূল স.-এর নাফরমানী করা হয়। এরূপ কোনো কাজের নির্দেশ দিলে জনগণ তা পালন করতে বাধ্য হবে না। কেননা, হারাম কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্য করাও হারাম। হাদীসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

www.icsbook.info

الا ان يؤمن بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ـ

"কোনো নাফরমানীমূলক কাজের আদেশ করা হলে জনগণ তাও শুনবে না, পালন করবে না।"

প্রথমোক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরগণ একথাই বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেছেন ঃ

اى فيما يامروا كم به من طاعة اللّه لا فى معصية اللّه لانه لاطاعة لمخلوق فى معصية اللّه ـ

"রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসম্পন্ন লোকদের আনুগত্য করতে হবে সেসব কাজে যা করলে আল্লাহর আনুগত্য হবে। আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনো আনুগত্য করা চলে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যেতে পারে না।"

মু'মিন মহিলাদের 'বায়আত' গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রসূলে করীম স.-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ـ الممتحنة : ١٢

"হে নবী! তোমার কাছে মু'মিন মহিলারা যখন 'বায়আত' গ্রহণের জন্যে আসবে, তখন তুমি বায়আত গ্রহণ করবে একথার ওপর যে, তারা শরীক করবে না কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে, তারা চুরি করবে না, তারা ব্যভিচার করবে না, তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা মিথ্যা-মিথ্যি ও প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবে কারোর ওপর অকারণে দোষারোপ করবে না। এবং তারা ন্যায়সংগত কাজে—হে নবী! তোমার নাফরমানী করবে না। এসব শর্তে তুমি তাদের কাছ থেকে 'বায়আত' গ্রহণ করলে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"–সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ১২

রসূলে করীম স. নিশ্চয়ই কখনো খারাপ কাজের নির্দেশ দিতেন না, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজ করতে বলতেন না, একথা সুস্পষ্ট কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনের পূর্বোদ্ধৃত 'মারূফ' বা ন্যায়সংগত কাজের শর্তের কথা স্পষ্ট ভাষায়

www.icsbook.info

উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এক সাথে দু'টি কথা প্রমাণিত হয় ঃ আনুগত্য শর্তহীন হতে পারে না এবং আল্লাহ ও রসূল স.-এর নাফরমানীর আনুগত্য করা যেতে পারে না।

আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ পালন করা যেতে পারে না, তা করা হলে শরীয়তের সীমালংঘন করা হবে। সে জন্যে আদেশদাতা ও আদেশ পালনকারী উভয়কেই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখিত একটি ঘটনা অকাট্য প্রমাণ পেশ করে। নবী করীম স. জনৈক আনসারীর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। লোকদেরকে সে আনসারীর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিদেশে থাকাকালে সেনাধ্যক্ষ সাথের লোকদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের কাষ্ঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়। তা দিয়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হলে সবাইকে তাতে ঝাঁপ দেয়ার নির্দেশ দেয়। পরে এ ঘটনার কথা রসূলে করীম স.-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ

لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعة فى المعروف-

"লোকেরা যদি সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে তারা চির জাহান্নামী হতো। আসলে ন্যায়সংগত কাজেই নেতার আদেশের আনুগত্য করতে হবে, নাফরমানী ও অন্যায় কাজে নয়।"

–সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ১১৩-১১৪ পৃষ্ঠা।

অন্যায়কারী, অনাচারী ও অত্যাচারী রাষ্ট্র শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করা এবং তাদের শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম মেনে নেয়া ও সমর্থন করার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক। দুনিয়ায়ও যেমন সে জন্যে দুঃখ ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয় তেমনি পরকালেও নিমজ্জিত হতে হবে কঠিন আযাবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا۠ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا۠- الاحزاب : ٦٧-٦٨

"লোকেরা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা দুনিয়ায় আমাদের নেতৃবৃন্দের ও বড়দের আনুগত্য করেছি। ফলে তারা আমাদের গোমরাহ করেছে। অতএব হে রব! তুমি আজ তাদের দ্বিগুণ আযাব দাও, এবং তোমার রহমত থেকে তাদের বহুদূরে সরিয়ে দাও।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৬৭-৬৮

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ

www.icsbook.info

الْاَسْبَابُ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَاهُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ○ ـ البقرة : ١٦٦-١٦٧

"আল্লাহ যখন শাস্তি দিবেন তখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে যে, দুনিয়াতে যেসব নেতা ও প্রধান ব্যক্তির অনুসরণ করা হতো তারা নিজ নিজ অনুসারীদের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সকল উপায়-উপাদানের সম্পর্ক ও কার্যকারণ ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর দুনিয়ায় যারা তাদের অনুসরণ করতো তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে আবার যদি সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের দায়িত্বহীন থাকার কথা প্রকাশ করছে আমরাও তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সকল কাজ—যাকিছু তারা দুনিয়াতে করেছে—তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা শুধু লজ্জিত হবে ও দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু জাহান্নামের গর্ভ থেকে বের হবার কোনো পথই তারা খুঁজে পাবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৬-১৬৭

অর্থাৎ শরীয়তে আনুগত্যের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম উম্মাত সে আনুগত্যের সীমাকে কখনোই এবং কিছুতেই লংঘন করতে পারে না। করলে সে জন্যে আল্লাহর কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

দ্বিতীয় ঃ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া

রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া জনগণের দ্বিতীয় কর্তব্য, জনগণের ওপর রাষ্ট্রের দ্বিতীয় অধিকার। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে যে কোনো কাজ করাকে ইসলামে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে প্রদত্ত উৎসাহ বাণীতে ভরপুর হয়ে রয়েছে। ইসলামে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কাজে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা জনগণের দীনী ফরয। এ কাজের বিরাট সওয়াবের কথা ঘোষিত হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। আর যে লোক এ কাজে কুণ্ঠিত হবে, ইচ্ছা করে গাফলতি দেখাবে, তার কঠিন আযাব হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

কুরআনের নির্দেশ হলো ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ـ

www.icsbook.info

"বের হয়ে পড়ো একাকী বা দলবদ্ধভাবে—হালকাভাবে কিংবা ভারি-ভাবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো আল্লাহর পথে।"–সূরা আত তওবা ঃ ৪১

হাদীসে হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ

يا رسول الله اى العمل افضل -

"ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন কাজ সর্বোত্তম ?"

তিনি বললেন ঃ

الايمان بالله والجهاد فى سبيله -

"আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা।"

–রিয়াদুস সালেহীন, পৃষ্ঠা-৪৬৯।

দেশ রক্ষার জন্যে জিহাদের ব্যবস্থাপনা করা এবং প্রয়োজন মতো জনগণ এ কাজে যাতে করে যোগ দিতে পারে তার পথ উন্মুক্ত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এ ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই প্রয়োজন মতো এবং যুগোপযোগী হতে হবে। যুগোপযোগী শক্তি-সামর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করাতো রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। আর জিহাদের এ ফরয কেবলমাত্র মুসলিম নাগরিকদের উপর, অমুসলিমদের উপর তা ফরয নয়। কিন্তু অনুগত অমুসলিম নাগরিকও এতে মুসলমানদের সাথে শরীক হতে পারে। প্রতিরক্ষার এ দায়িত্ব পালনের জন্যেই ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ওপর 'জিযিয়া' কর ধার্য হয়ে থাকে। কিন্তু তারা যদি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করে, তাহলে এ জিযিয়া কর রহিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয।

ঃ সমাপ্ত ঃ

www.icsbook.info

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)**
  –মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)**
  –মতিউর রহমান খান
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  –ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২খণ্ড)**
  –ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী র.
- **ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা**
  –সাইয়েদ কুতুব
- **আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম**
  –আবদুল মান্নান তালিব
- **আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব**
  –মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
- **সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.